ঃ ৩ সংখ্যা ঃ ৯ জানুয়ারি- মার্চ-২০০৭

ইসলামিক ল' রিসার্চ সেন্টার এন্ড লিগ্যাল এইড বাংলাদেশ এর ত্রৈমাসিক গবেষণা পত্রিকা

ইসলামী আইন ও বিচার

ISSN 1813 - 0372

ইসলামী আইন ও বিচার

ত্রৈমাসিক গবেষণা পত্রিকা

ইসলামিক ল' রিসার্চ সেন্টার এন্ড লিগ্যাল এইড বাংলাদেশ

ISLAMI AIN O BICHAR

ইসলামী আইন ও বিচার
বর্ষ : ৩ সংখ্যা : ৯

প্রকাশনায় : ইসলামিক ল' রিসার্চ সেন্টার এন্ড লিগ্যাল এইড বাংলাদেশ-এর পক্ষে এডভোকেট **মোহাম্মদ নজরুল ইসলাম**

প্রকাশকাল : জানুয়ারী-মার্চ ২০০৭

যোগাযোগ : এস এম আবদুল্লাহ
সমন্বয়কারী
ইসলামিক ল' রিসার্চ সেন্টার এন্ড লিগ্যাল এইড বাংলাদেশ
১৪ পিসি কালচার ভবন (৪র্থ তলা)
শ্যামলী বাসস্ট্যান্ড, ঢাকা-১২০৭
ফোন : ৯১৩১৭০৫, ফ্যাক্স : ৮১৪৩৯৬৯ মোবাইল : ০১৭১২ ৮২৭২৭৬
E-mail : islamiclaw_bd@yahoo.com

প্রচ্ছদ : মোমিন উদ্দীন খালেদ

কম্পোজ : তাসনিম কম্পিউটার, মগবাজার, ঢাকা

মুদ্রণে : আল ফালাহ প্রিন্টিং প্রেস, মগবাজার, ঢাকা-১২১৭

দাম : ৩৫ টাকা US $ 3

---

*Published by Advocate **MUHAMMAD NAZRUL ISLAM** General Secretary, Islamic Law Research Centre and Legal Aid Bangladesh. 14, Pisciculture Bhaban (3rd Floor) Shymoli Bus Stand, Dhaka-1207,Bangladesh. Printed at Al-Falah Printing Press, Moghbazar, Dhaka, Price Tk. 35 US $ 3*

সূচিপত্র

সম্পাদকীয়

ক্ষমতা যার আইন তার

ক্ষমতা বলতে একটা শক্তি বুঝায়। মাটির মধ্যে একটা শক্তি আছে। একটা বীজ মাটিতে বপন করা হলো। মাটির শক্তি বীজে অনুপ্রবেশ করলো। বীজে শক্তি সঞ্চারিত হলো। মাটি ভেদ করে গজিয়ে উঠলো সবুজ একটা চারা। এ চারা যত বড় হতে থাকলো তার শক্তিও তত বাড়তে থাকলো। শেষে অবস্থা এমন দাঁড়ালো একটা বন্য হাতির শক্তিও তার কাছে হার মানলো। আমরা দেখছি মাটির মধ্যে শক্তি, গাছের মধ্যে শক্তি, হাতির মধ্যে শক্তি। এমনিভাবে দুনিয়ার সব জিনিসের মধ্যে শক্তি। কম বেশি অনেক বেশি অনেক কম। আবার এই শক্তিগুলোর তারতম্যও বড়ই চমকপ্রদ। একটা ছোট শক্তিও বড় শক্তিকে হার মানায়। সিংহ ও ইঁদুরের গল্প সবার জানা। বিপদ থেকে সিংহ উদ্ধারই পেতে পারছিল না। শিকারীর জাল কাটার ক্ষমতা ও শক্তি তার ছিল না। কিন্তু একটা ছোট্ট ইঁদুর তার ধারালো দাঁত দিয়ে জাল কেটে মিনিটের মধ্যে তাকে উদ্ধার করলো।

বুঝা গেলো শক্তি সবার মধ্যে। জীব ও জড়ের মধ্যে। প্রাণী ও অপ্রাণীর মধ্যে। সাগরের তরংগ, নদীর স্রোত, বন্যার প্লাবন, পাহাড়ের ধস, আগ্নেয়গিরির অগ্ন্যুৎপাত, ভূকম্পন, সুনামী এক একটা জড় শক্তি এবং মহাশক্তি। তবে জীবের মধ্যে মানুষের শক্তি অকল্পনীয়। মানুষের শক্তির মূল তার দেহে নয় মস্তিষ্কে। অসীম কল্পনা শক্তি মানুষ ছাড়া অন্য কোনো জীবের নেই। অন্য জীবের তুলনায় মানুষের কৌশলও অনন্য। আবার বুদ্ধিবৃত্তিক কৌশলের দিক দিয়ে মানুষ একজন আর একজনকে ছাড়িয়ে যায়। এই বুদ্ধি ও কৌশলের ভিত্তিতে দুনিয়ায় একজন আর একজনের ওপর আধিপত্য করে। এসবই শক্তি ও ক্ষমতার কারসাজি।

জীবের মধ্যে প্রত্যেকে যার যার ক্ষমতা ব্যবহার করে। তবে একমাত্র মানুষই মনে করে তার ক্ষমতা অসীম। তাই সে যাচ্ছেতাই করে।

কিন্তু আসলে মানুষের ক্ষমতা কি অসীম? মানুষের কেন কোনো জীবের মূলত কোনো ক্ষমতাই নেই। কারণ জীব মাত্রই মৃত্যুর অধীন। আর এ মৃত্যু কখন আসবে সে জানে না। মানুষ হয়তো বিস্ময়কর একটা আবিষ্কারের সূত্র উদ্ভাবন করলো। কিন্তু সেই মুহূর্তে মৃত্যুদূত এসে তার জান কবজা করে নিয়ে চলে গেলো। আবিষ্কার আর হলো না। আসলে যে আল্লাহ তাকে সৃষ্টি করেছেন, যিনি বিশ্বজাহান চালাচ্ছেন তিনিই ঐ বিশেষ মানুষটির মাথায় জ্ঞানের সূত্রগুলোর

সন্নিবেশ ঘটিয়েছেন। আবর তিনিই তাকে মৃত্যু দিয়েছেন। কারণ তিনি চান না পৃথিবী এই মুহূর্তে বিজ্ঞানের এই আবিষ্কারে সমৃদ্ধ হোক। তিনি যখন চাইবেন তখন মানুষ আবিষ্কারটি করবে। তাহলে দেখা গেলো ক্ষমতা মানুষের হাতে নয় ক্ষমতা রয়েছে আল্লাহর হাতে। 'তোমার রব তো শক্তিমান পরাক্রমশালী।' (হূদ : ৬৬) কেবল শক্তিমান নন বরং এত বেশি শক্তিমান যার মধ্যে পরাক্রম রয়েছে। কুরআনের মূল শব্দে বলা হয়েছে 'আযীয'। আযীয এমন এক শক্তিকে বুঝায় যাকে অতিক্রম করা কঠিন এবং সম্ভব নয়। অর্থাৎ আল্লাহর মতো শক্তি আর কারোর নেই। সূরা যারিয়াতের ৫৮ আয়াতে বলা হয়েছে, ইন্নাল্লাহা হুয়ার রায্যাকু যুল কুও্ওয়াতিল মাতীন– 'আল্লাহ্ সবার রিযিকদাতা এবং তিনি নিরংকুশ নিরেট (Solid) শক্তির অধিকারী।' অর্থাৎ তাঁর শক্তির মধ্যে কোনো ফাঁক নেই যে সেখান থেকে কেউ অংশ নেবে। সমস্ত শক্তির আধার তিনি। সেখান থেকে তিনি যাকে যতটুকু ইচ্ছা শক্তি দেন। তাকে শক্তির মালিক করেন না বরং শক্তিকে তার গুণগত ক্ষমতায় পরিণত করেন। যখন ইচ্ছা শক্তি তার কাছ থেকে ছিনিয়ে নেন।

এতটুকু আলোচনা করার পর মনে হয় কেউই একথা অস্বীকার করতে পারবেন না আমরা প্রত্যেকে বিভিন্ন প্রকারের শক্তি যতটুকুন লাভ করেছি এর মালিক আমরা নই। কারণ যেকেনো মুহূর্তে এ শক্তি আমাদের হাত থেকে চলে যেতে পারে। স্মৃতিভ্রষ্ট হয়ে মস্তিষ্কের শক্তি বিকল হয়ে যেতে পারে। রোগে ও পার্থিব দুর্বিপাকে শারীরিক শক্তি দুর্বল ও অকেজো হয়ে যেতে পারে। কাজেই আমাদের শক্তির ওপর আমাদের কর্তৃত্ব নেই। কর্তৃত্ব আছে আর একজনের।

এখানে আর একটা কথাও ভেবে দেখার মতো। আমরা যে শক্তিগুলো অর্জন করেছি সেগুলো একটা নিয়ম শৃঙ্খলার মধ্য দিয়ে শক্তিতে পরিণত হয়েছে। যেমন হাতের শক্তি, মুখের শক্তি, চোখের শক্তি। হাত দিয়ে কোনো জিনিস ধরি। কোনটা ধরবো এবং কোনটা ধরবো না। যদি আগুন হাত দিয়ে ধরি তাহলে হাত পুড়ে যাবে। এটা হলো নিয়ম শৃংখলা। আগুন হাত দিয়ে না ধরাই নিয়ম। এ নিয়ম আমাকে মেনে চলতে হয়। এ নিয়ম না মানলে হাত পুড়ে গিয়ে হাতের শক্তি খতম হয়ে যাবে। তেমনি মুখের শক্তি। মুখ দিয়ে কথা বলি। সঠিক কথা না বলে অন্যের বিরুদ্ধে অকথ্য ভাষায় অশ্রাব্য গালিগালাজ করে তার সংগে ঝগড়া বেঁধে জীবন সংশয় দেখা দেবে। এভাবে চোখ দিয়ে চোখের দেখার নিয়মের বাইরে দুপুরের সূর্যের দিকে তাকিয়ে যদি দেখতে থাকি তাহলে নিসন্দেহে চোখের শক্তি খতম হয়ে যাবে। এভাবে আমরা দেখি আমাদের যে শক্তিগুলো আছে সবই একটা নিয়ম শৃংখলার অধীন। এ নিয়ম শৃংখলায় ব্যত্যয় ঘটলে শক্তির বিনাশ অবধারিত।

আমরা চাই বা না চাই এ নিয়ম শৃংখলা আমাদের মেনে চলতে হয়। এরা আমাদের অধীন নয়, আমরা এদের অধীন। 'তারা কি আল্লাহর বিধান ছাড়া অন্য কিছু চাচ্ছে? অথচ আকাশে ও পৃথিবীতে যা কিছু আছে স্বেচ্ছায় ও অনিচ্ছায় তাঁরই কাছে আত্মসমর্পণ করেছে। আর তাঁর দিকেই তাদের ফিরে যেতে হবে।' (আলে ইমরান : ৮৩) 'আল্লাহকে সিজদা করছে পৃথিবীও

আকাশের প্রত্যেকটি বস্তু ইচ্ছায় ও অনিচ্ছায় এবং প্রত্যেকটি বস্তুর ছায়া সকাল সাঁঝে তাঁর সামনে নত হয়।' (আর রা'দ : ১৫) এখানে সিজদা করা মনে আনুগত্য প্রকাশ ও আদেশ পালন করার জন্য মাথা নত করা। অর্থাৎ পৃথিবী ও আকাশের প্রত্যেকটি সৃষ্টি আল্লাহর নিয়মের ও আইনের অনুগত। তাঁর ইচ্ছার চুল পরিমাণ বিরোধিতা করার ক্ষমতা তাদের নেই। এ অর্থে তারা প্রত্যেকে আল্লাহকে সিজদা করছে। এমনকি তাদের ছায়াগুলোও সকাল সাঁঝে পূর্ব-পশ্চিমে হেলে পড়ছে। অর্থাৎ আল্লাহর আনুগত্য প্রকাশ করছে।

পৃথিবীতে যা কিছু শক্তি ও ক্ষমতা আমরা দেখছি তার কেন্দ্রে রয়েছে একটা নিয়ম শৃংখলা ও আইন। এই নিয়ম শৃংখলা ও আইন মানুষের বা অন্য কোনো জীব ও জড়ের নয় বরং আল্লাহর তৈরি। আমাদের ভাষায় আমরা একে বলি প্রাকৃতিক নিয়ম ও প্রাকৃতিক আইন। এই প্রকৃতি আল্লাহর তৈরি। 'আল্লাহর প্রকৃতির ওপর প্রতিষ্ঠিত হওয়ার জন্য তিনি মানুষকে সৃষ্টি করেছেন। আল্লাহর তৈরি এ প্রাকৃতিক কাঠামো অপরিবর্তনীয়।' (রুম : ৩০) অর্থাৎ আল্লাহ যে প্রাকৃতিক কাঠামো তৈরি করেছেন এবং যে প্রাকৃতিক কাঠামোর ভিত্তিতে মানুষকে সৃষ্টি করা হয়েছে তার মধ্যে কোনো পরিবর্তন আনার ক্ষমতা কারোর নেই। প্রকৃতি নিজের তৈরি নয়। প্রকৃতি তার নিয়মের মধ্যে কোনো পরিবর্তন করার ক্ষমতা রাখে না, এটাই প্রমাণ করে সে তার নিজের তৈরি নয়। প্রকৃতি নিয়ম ও শৃঙ্খলার নাম। আর এ নিয়ম ও শৃংখলা সব সময় আল্লাহর অনুগত। 'অতপর তিনি আকাশ ও পৃথিবীকে বললেন, তোমরা উভয়ে ইচ্ছায় বা অনিচ্ছায় আমার বিধানের অনুগত হয়ে এসো। তারা বললো আমরা এলাম অনুগত হয়ে।' (হামীম আস সাজদা : ১১) একমাত্র মানুষ ব্যতিক্রম। মানুষ অনুগত হয়ে অর্থাৎ স্বেচ্ছায় আসে আবার অনুগত না হয়েও অর্থাৎ অনিচ্ছায় তাকে আসতে হয়। আল্লাহর বিধানকে অস্বীকার করলেও আল্লাহর সৃষ্ট প্রাকৃতিক নিয়ম ও বিধান তাকে মেনে নিতেই হয়।

'বিধান দেবার অধিকার একমাত্র আল্লাহর।' (ইউসুফ : ৪০)

'তিনি দিনকে রাত্রি দিয়ে আচ্ছাদিত করেন যাতে তারা একে অন্যকে দ্রুতগতিতে অনুসরণ করে আর সূর্য চন্দ্র ও তারকারাজি তিনিই সৃষ্টি করেছেন, এরা তাঁর আজ্ঞাধীন। জেনে রাখো, সৃজন ও আদেশ তাঁরই। মহিময় জগতসমূহের প্রতিপালক আল্লাহ।' (আরাফ : ৫৪) আল্লাহ সমস্ত বিশ্বজগত এবং এর মধ্যে যা কিছু আছে সব সৃষ্টি করেছেন। সবার প্রতিপালন করছেন। কাজেই সবাই তাঁর হুকুম ও বিধানের অধীন। সৃষ্টি করবেন একজন, প্রতিপালন করবেন তিনি এবং বিধান চলবে অন্যের এ ধরনের অস্বাভাবিকতা পরিবেশ বিরোধী, যুক্তি বিরোধী এবং এর ফলে বিপর্যয় ও ধ্বংস নেমে আসে। অথচ পৃথিবী ও আকাশের সকাল সৃষ্টি জীব ও জড় তাঁর কাছে আত্মসমর্পণ করেছে। সকল শক্তির কেন্দ্রে তিনি অবস্থান করছেন। তিনি ছাড়া শক্তির আর কোনো উৎস নেই। কাজেই শক্তি ও ক্ষমতা যার হাতে বিধানও তাঁরই চলবে।

মানুষ বিধান তৈরি করার দায়িত্ব নিয়েছে। তার জীবন যাপনের ও পৃথিবীতে চলার পথ সুগম করার জন্য বিধান তৈরি করতে হয়। কিন্তু ক্ষমতার উৎস যেখানে সেখান থেকে বিধান উৎসারিত

হয়েছে। সেই বিধানের সাথে সামঞ্জস্য রেখে বা তার অধীনে ও আওতাধীনে যে বিধান তৈরি হয় একমাত্র সেটিই হয় মানুষের স্বভাব প্রকৃতির সাথে সামঞ্জস্যশীল এবং মানুষের জন্য কল্যাণকর বিধান।

কাজেই মানুষের জন্য স্বাধীন সার্বভৌম বিধান তৈরি করার কোনো অধিকার ও ক্ষমতা মানুষের নেই। মানুষ কেবলমাত্র আল্লাহর সার্বভৌম ক্ষমতা এবং আল্লাহর তৈরি বিধানের আওতায় নিজের জন্য আংশিক বিধান রচনা করতে পারে। সূরা আরাফের ৫৪ আয়াতে আল্লাহ এ কথা সুস্পষ্টভাবে বলেছেন– আলা লাহুল খাল্কু ওয়াল আমর। অর্থাৎ সৃষ্টি তিনিই করেছেন এবং আইন একমাত্র তাঁরই চলবে। সূরা শূরার ১৩ আয়াতে বলেছেন, 'তিনি তোমাদের জন্য বিধান বিধিবদ্ধ করেছেন, এর নির্দেশ তিনি দিয়েছিলেন নূহকে, 'এর নির্দেশ দিয়েছি তোমাকে এবং এর নির্দেশ দিয়েছিলাম ইবরাহীম, মূসা ও ঈসাকে।' অর্থাৎ অতীতেও আল্লাহর বিধানের ভিত্তিতে আইন তৈরি হয়েছে এবং বর্তমানেও এটিই একমাত্র পথ।

আবদুল মান্নান তালিব

ইসলামী আইন ও বিচার
জানুয়ারী-মার্চ ২০০৭
বর্ষ ৩, সংখ্যা ৯, পৃষ্ঠা : ৯-৩১

ইসলামী শরীআহ্ এর লক্ষ ও উদ্দেশ্য

ড. মোহাম্মদ মানজুরে ইলাহী

আল্লাহ রব্বুল আলামীন মানুষ ও এ বিশ্বজগতসহ সকল কিছু সৃষ্টি করেছেন। সুস্থ, সুন্দর ও শান্তিপূর্ণভাবে বসবাসের জন্য তিনি একটি পরিপূর্ণ জীবন-ব্যবস্থা হিসাবে মানুষকে প্রদান করেছেন ইসলামী শরীআহ।

শরীআহ্ এর সংগা

'শরীআহ' একটি আরবী শব্দ। এর আভিধানিক অর্থ দীন, ধর্ম, জীবন-পদ্ধতি, নিয়ম-নীতি ইত্যাদি।[১] তবে আরবী ভাষায় শব্দটির বুৎপত্তিগত অর্থ হল– পানির উৎস স্থল বা যে স্থান থেকে পানি উৎসারিত হয়ে গড়িয়ে পড়ে এবং মানুষ সেখানে এসে পানি পান করে পিপাসা নিবারণ করে।[২]

পরিভাষায় শরীআহ এর সংগায় ইমাম ইবনে তাইমিয়া র. বলেন, আল্লাহ তা'আলা যেসব আকীদা ও আমল মানুষের জন্য প্রণয়ন করেছেন তাই শরীআহ।[৩] অন্যত্র তিনি বলেছেন, 'শরীআহ হচ্ছে আল্লাহ তা'আলা, রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ও উলুল আমর (তথা মুসলিম প্রশাসক ও আমীর) এর আনুগত্য করা'।[৪]

ইসলামী শরীআহ এর সংগা আরো সহজভাবে আমরা এভাবে দিতে পারি, 'মহান আল্লাহ তা'আলা জীবন ও জগত পরিচালনার জন্য রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের মাধ্যমে নিজের বান্দাদেরকে যে সার্বিক হুকুম ও বিধান প্রদান করেছেন, তা-ই হলো ইসলামী শরীআহ'।

ইসলামী শরীআহ্ এর বৈশিষ্ট

ইসলামী শরীআহ এর অনেক বৈশিষ্ট রয়েছে। তন্মধ্যে বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ বৈশিষ্ট্যসমূহ নীচে তুলে ধরা হলো :

১. এটি রব্বানী তথা আল্লাহ্ প্রদত্ত : এ শরীআহ প্রণয়ন করেছেন সেই মহান স্রষ্টা যিনি মানুষ ও জগত সৃষ্টি করেছেন এবং জগতের স্থান-কাল-পাত্রভেদে মানুষের জন্য যা যা সবচেয়ে কল্যাণকর তা তিনি জানেন। আল্লাহ বলেন, 'আপনার প্রতিপালক যা ইচ্ছা সৃষ্টি করেন এবং যাকে ইচ্ছা মনোনীত করেন, এতে তাদের কোন হাত নেই। আল্লাহ পবিত্র, মহান এবং তারা যে শরীক করে

লেখক : সহকারী অধ্যাপক, ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগ, জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়, গাজীপুর।

তা হতে তিনি উর্ধে।[৫] 'যিনি সৃষ্টি করেছেন তিনি কি জানেন না? তিনি সূক্ষ্মদর্শী ও সম্যক অবগত'।[৬] 'আল্লাহ সর্বজ্ঞ, প্রজ্ঞাময়'।[৭]
অতএব ইসলামী শরীয়াহ সকল ত্রুটিমুক্ত ও মানবতার জন্য সবচেয়ে বেশি কল্যাণকর।

২. এটি গোটা বিশ্বমানবতার জন্য : ইসলামী শরীআহ এর সমস্ত আহকাম, বুনিয়াদী নীতিমালা ও লক্ষ্য-উদ্দেশ্য জাতি, দেশ, কাল ও বর্ণ নির্বিশেষে বিশ্বের সকল মানুষের জন্য প্রযোজ্য। মহান আল্লাহ বলেন, 'আর আমি তো আপনাকে বিশ্বজগতের প্রতি রহমতস্বরূপই পাঠিয়েছি'।[৮] 'বলুন, হে মানবমণ্ডলী! আমি তোমাদের সকলের কাছে প্রেরিত আল্লাহর রসূল।'[৯] 'আর আমি তো আপনাকে সমগ্র মানব জাতির প্রতি সুসংবাদদাতা ও সতর্ককারীরূপে পাঠিয়েছি।'[১০]

৩. ব্যাপকতা : ইসলামী শরীআহর রয়েছে মানব জীবনের প্রতিটি দিকের সাথে সম্পর্কিত নীতিমালা, আহকাম ও আইন-কানুন, চাই তা মানুষের আকীদা, ইবাদত ও চরিত্রের সাথে সংশ্লিষ্ট হোক কিংবা ব্যক্তি, সমাজ ও দেশের অর্থনীতি, রাজনীতি ও বিচার পদ্ধতি সংক্রান্ত হোক। আল্লাহ তাআলা বলেন, 'আমি প্রত্যেক বিষয়ে ব্যাখ্যাস্বরূপ এবং মুসলমানদের জন্য হিদায়াত, রহমত ও সুসংবাদস্বরূপ আপনার প্রতি কিতাব নাযিল করেছি।'[১১]

৪. মৌলিকত্ব ও স্থায়িত্ব : ইসলামী শরীয়াহ এর নীতিমালা মৌলিক এবং এর উৎস সংরক্ষণের দায়িত্ব আল্লাহ নিজে নিয়েছেন বলে তা কিয়ামত পর্যন্ত স্থায়ী। আল্লাহ বলেন, 'নিশ্চয় আমিই কুরআন নাযিল করেছি এবং আমিই এর সংরক্ষক।'[১২]

৫. পালনে সহজতা ও কঠোরতা বিলোপ : মানুষ যাতে ইসলামী শরীআহ এর আহকাম বিধান অত্যন্ত সহজে পালন করতে পারে মহান আল্লাহ তাআলা সেভাবেই শরীআহ নীতিমালা প্রণয়ন করেছেন। তদুপরি পালন করতে গিয়ে যখনই কেউ কোন যুক্তিগ্রাহ্য সমস্যার মুখোমুখি হয়, তখনই তার উপর থেকে হুকুমের ভার হালকা করে দেয়া হয়। আল্লাহ তাআলা বলেন, 'আল্লাহ তোমাদের জন্য তাই চান যা সহজ এবং যা তোমাদের জন্য কষ্টসাধ্য তা তিনি চান না।'[১৩] 'আল্লাহ দীনের ব্যাপারে তোমাদের উপর কোন কঠোরতা আরোপ করেননি।'[১৪] 'আল্লাহ কারো উপর এমন কোন কষ্টদায়ক দায়িত্ব অর্পণ করেন না যা তার সাধ্যাতীত।'[১৫]

৬. বৈষয়িক ও আধ্যাত্মিক ব্যাপারে চমৎকার সমন্বয় : ইসলামী শরীআহ একদিকে যেমন ইবাদত করার মাধ্যমে মানুষকে আখিরাতমুখী হতে উদ্বুদ্ধ করেছে, অন্যদিকে দুনিয়ার বাস্তব জীবনের প্রয়োজন ও দাবি পূরণের নির্দেশও তাকে দিয়েছে। দুনিয়ার কাজ ও ব্যস্ততার মধ্যেও যাতে মানুষ আল্লাহর ইবাদত করে সেদিকে ইঙ্গিত করে আল কুরআনে বলা হয়েছে, 'সেসব লোক যাদেরকে ব্যবসা-বাণিজ্য ও ক্রয়-বিক্রয় আল্লাহর স্মরণ হতে এবং সালাত কায়েম ও যাকাত প্রদান হতে বিরত রাখে না– তারা ভয় করে সেদিনকে যেদিন অনেক অন্তর ও দৃষ্টি বিপর্যস্ত হয়ে পড়বে।'[১৬] আবার ইবাদত অনুষ্ঠানের পাশাপাশি তাদেরকে জীবিকা অর্জনের নির্দেশও প্রদান করা হচ্ছে। 'সালাত সমাপ্ত হলে তোমরা পৃথিবীতে ছড়িয়ে পড়ো এবং আল্লাহর অনুগ্রহ (জীবিকা) সন্ধান কর।'[১৭]

৭. ব্যক্তি ও সমষ্টির যথার্থ মূল্যায়ন : ইসলামী শরীআহ্ ব্যক্তি ও সমষ্টির কারো স্বার্থহানি না করে সকলের স্বার্থের প্রতি সমান দৃষ্টি রেখেছে। ইসলামে ব্যক্তি মালিকানা ও ব্যক্তিস্বার্থকে কখনো অবজ্ঞা করা হয় না, তবে ব্যক্তি ও সামষ্টিক স্বার্থের মধ্যে বিরোধ দেখা দিলে তখন সামষ্টিক স্বার্থকে অগ্রাধিকার দেয়া হয়।

৮. যুগোপযোগিতা : ইসলামী শরীআহ্ গতিশীল। কালের আবর্তনে উদ্ভূত সকল সমস্যার সমাধানের জন্য কুরআন ও সুন্নাহভিত্তিক চিন্তা-গবেষণার সুনির্দিষ্ট নীতিমালা এতে রয়েছে। সুতরাং যাবতীয় নতুন অবস্থার সাথে তা সামঞ্জস্যশীল হতে সক্ষম। মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের যুগ থেকে শুরু করে আজ পর্যন্ত যেমন এর সফল কার্যকারিতা রয়েছে, তেমনি কিয়ামত পর্যন্ত এর কার্যকারিতা অক্ষুণ্ন থাকবে। কেননা কিয়ামত পর্যন্ত এটিই আল্লাহর দেয়া সর্বশেষ ও একমাত্র জীবন ব্যবস্থা।

৯. উদারতা : ইসলামী শরীআহ উদারতা সম্পন্ন। এ প্রসঙ্গে রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, 'আমাকে উদারতাসম্পন্ন দীন সহকারে প্রেরণ করা হয়েছে।'[১৮] এর ফলে অমুসলিমগণ ও তাদের ধর্মবিশ্বাসসহ ইসলামী রাষ্ট্রে পরিপূর্ণ নিরাপত্তা লাভ করে থাকেন।

ইসলামী শরীআহ এর গুরুত্ব : শরীআহ ও সমাজের মধ্যে একটি নিবীড় বন্ধন রয়েছে। বহু ব্যক্তির সমন্বয়ে সমাজ গড়ে উঠে। বিভিন্ন প্রাকৃতিক প্রয়োজনের প্রতিক্রিয়ায় সৃষ্টিলগ্ন থেকেই সমাজের প্রত্যেকের রয়েছে নানাবিধ চাহিদা। ব্যক্তি একাই নিজের সেসব চাহিদা মেটাতে সক্ষম নয়। সে জীবন ও জীবিকার প্রয়োজনে সমাজের অন্যদের সহযোগিতার মুখাপেক্ষী। ফলে স্বভাবতই মানুষের জীবন হয়ে পড়েছে সৃষ্টির আদিকাল থেকেই সমাজবদ্ধ। সমাজের সকলের অধিকারকে সুশৃংখলভাবে সংরক্ষণ করার জন্য প্রয়োজন একটি পরিপূর্ণ আইনী ব্যবস্থা বা বিধানের, যা তাদের পারস্পরিক সম্পর্ক নির্ণয় করবে, অধিকারের সীমা নির্দিষ্ট করে দেবে এবং প্রত্যেকের স্বেচ্ছাচারিতাকে আইনের দ্বারা নিয়ন্ত্রিত করবে। এ ব্যবস্থা না হলে মানুষের সামষ্টিক জীবন হয়ে পড়বে খুবই দুষ্কর। কেননা মানুষের একটা প্রবণতা হচ্ছে নিজের সুবিধা ও স্বার্থকে বড়ো করে দেখা। এ প্রবণতা যদি আইন দ্বারা সুনিয়ন্ত্রিত না হয় তাহলে পারস্পরিক যুলুম-নির্যাতন বেড়ে যাবে, অধিকার ক্ষুণ্ন হবে এবং সমাজে বিপর্যয় সৃষ্টি হবে। আর প্রতাপশালী ও কূটজাল বিস্তারকারীদের দৌরাত্ম প্রতিষ্ঠিত হবে। সুতরাং মানুষ সব সময়ই সুশৃঙ্খল আইন-কানুন সম্বলিত এমন এক ব্যবস্থা মেনে চলার তীব্র প্রয়োজন অনুভব করে, যাতে সমাজের সকলের অধিকার নিশ্চিত হয়, কেউ কারো অধিকার হরণ করতে না পারে এবং কেউই তার নিজের সীমা লংঘন করে অন্যের সীমায় অনুপ্রবেশ করতে না পারে। বস্তুত একটা সুষম, কল্যাণমুখী ও সর্বাত্মক ব্যবস্থা ছাড়া মানুষের পক্ষে সুস্থ স্বাভাবিক সমাজ জীবন যাপন করা কোনমতেই সম্ভব নয়। এজন্যই আল্লাহর নাযিলকৃত শারীআত তাঁর অগণিত অন্য সব নিয়ামতের পাশাপাশি বিশ্বমানবতার প্রতি এক বিরাট রহমত। এর ভিত্তিতেই হতে পারে মানুষের যাবতীয় সমস্যার সার্থক সমাধান ও তাদের পারস্পরিক বিবাদ-বিসম্বাদের সুষ্ঠু মীমাংসা ও নিষ্পত্তি।

বস্তুত আল্লাহর শরীঅতই হচ্ছে তাঁর বান্দাদের মধ্যে পারস্পরিক ন্যায় প্রতিষ্ঠতার যথার্থ হাতিয়ার। নিঃসন্দেহে সমগ্র মানবতার প্রতি এটা তাঁর অনুগ্রহ ও করুণা। আল্লাহ তাআলা তাঁর বান্দাদেরকে নিজ নিজ জীবন, সংগঠন ও সমাজের উৎকর্ষ সাধনের ব্যাপারে কেবলমাত্র তাদের নিজস্ব বিবেক-বুদ্ধির উপর নির্ভরশীল ও মুখাপেক্ষী করে ছেড়ে দেননি, বরং তাদেরকে প্রবৃত্তির স্বেচ্ছাচার থেকে মুক্ত করেছেন ইসলামী শরীআহ এর বিধান প্রদান করে। মানব রচিত কোন বিধানই প্রবৃত্তির কামনা-বাসনা ও স্বেচ্ছাচার থেকে মুক্ত ও পবিত্র নয়। তা থেকে মুক্ত ও পবিত্র হচ্ছে আল্লাহর শরীআহ এর বিধান।

ইসলামী শরীআহ ও প্রচলিত আইনের মধ্যে পার্থক্য

ইসলামী শরীআহ এর মতই প্রচলিত মানব রচিত আইনসমূহ যদিও জনকল্যাণের অঙ্গীকার করে এবং সমাজের আইন, শৃঙ্খলা, নিরাপত্তা ও শান্তি নিশ্চিত করার আশাবাদ ব্যক্ত করে, কিন্তু এর সাথে ইসলামী শরীআহ এর রয়েছে অনেক পার্থক্য, যাতে ইসলামী শরীআহ এর শ্রেষ্ঠত্ব, মহত্ত্ব ও মর্যাদা সুস্পষ্ট হয়ে উঠে সকল মানব রচিত মতবাদ ও আইনের উপর, যা মানুষ তার সীমাবদ্ধ বিবেক-বুদ্ধি দিয়ে রচনা করেছে। এখানে কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ পার্থক্য তুলে ধরা হলো :

১. ইসলামী শরীআহ সব ধরনের ক্রটিমুক্ত। পক্ষান্তরে মানুষ যেহেতু তার সকল কাজে পদে পদে ভুল-ক্রটি, অজ্ঞতা ও অক্ষমতার মুখোমুখি হয়, ফলে তাদের তৈরি আইন ও মতবাদ হয়ে থাকে নানাপ্রকার ভুল-ক্রটি ও সীমাবদ্ধতায় পরিপূর্ণ। তদুপরি পরিবেশ, প্রবৃত্তি ও ভাবাবেগের প্রভাব ও প্রতিক্রিয়া থেকে তা মোটেই মুক্ত নয়। অথচ শরীআহ প্রণয়ন করেছেন সর্বজ্ঞানী মহাবিজ্ঞানময় এমন এক ইলাহ, আসমান ও যমীনের অনু পরিমাণ কোন বস্তুও যাঁর অগোচরে ও অজ্ঞাত নয়, যিনি মানুষকে সুন্দর অবয়বে সৃষ্টি করেছেন। ফলে স্বভাবতই তিনি তাদের সার্বিক কল্যাণের উপযোগী বিধান সম্পর্কে সম্যক জ্ঞান রাখেন। সাইয়েদ কুতুব র. তার 'মাআলিম ফিত-তারীক' গ্রন্থে বলেন, 'আল্লাহ মানব জীবনকে সুসংবদ্ধ করার জন্য যে শরীআহ প্রণয়ন করেছেন তা এমনই এক বিধান যা জগতের সাধারণ নিয়মের সাথে সম্পর্কিত ও সামঞ্জস্যপূর্ণ।....সুতরাং মানবজীবন ও যে জগতে সে বসবাস করে তার মধ্যে একটা সুসামঞ্জস্য বিধানের প্রয়োজনেই এ শরীআহ মেনে চলার আবশ্যকতা সৃষ্টি হয়। শুধু তাই নয়, যে আইন মানুষের ভেতরের স্বভাবকে নিয়ন্ত্রণ করে এবং যে আইন মানুষের বাহ্যিক জীবনকে পরিচালনা করে এতদুভয়ের মধ্যে সামঞ্জস্য বিধানের প্রয়োজনে এবং মানব ব্যক্তিত্বের ভেতর ও বাইরের উভয় দিকের মধ্যে একটা সঙ্গতি বিধানের প্রয়োজনেও এ শরীআহ মেনে চলা প্রয়োজন। মানুষ যখন জগতের সকল নিয়মনীতি জানার সামর্থ্য রাখে না এবং সাধারণ জাগতিক নিয়মের সকল দিক আয়ত্বও করতে পারে না, এমন কি যে সত্তা তাদের স্বভাব ও প্রকৃতি নিয়ন্ত্রণ করেন ও তাদেরকে নিজের অধীনস্ত করে রাখেন, তারা চাক বা না চাক– সে সত্তাকেও তারা আয়ত্ব করার সামর্থ্য রাখে না। তাহলে মানব জীবনের জন্য এমন বিধান রচনার অধিকার তাদের নেই, যদ্বারা মানুষের জীবন ও জগতের সঞ্চালনে এবং তাদের সুপ্ত

স্বভাব ও বাহ্যিক জীবনে একটা ব্যাপক সামঞ্জস্য সাধিত হতে পারে।.....এ কাজের অধিকার রাখেন জগতের স্রষ্টা, মানুষের স্রষ্টা, যিনি নিজের ইচ্ছামত একটি নিয়মের অধীনে জগত ও মানবকে পরিচালিত করেন.... ।'[১৯]

নিয়ম-কানুন ও আইন প্রণয়নে মানুষের মধ্যে বিস্ময়কর স্ববিরোধিতার উপস্থিতি সাইয়েদ কুতুবের উপরোক্ত বক্তব্যে প্রতিফলিত হয়েছে। কেননা পুঁজিবাদে মানুষ অসীম সম্পত্তির মালিক হতে পারে। পক্ষান্তরে কম্যুনিজম ও সমাজতন্ত্র এর পুরোপুরি বিপরীত। সেখানে ব্যক্তি সম্পদের মালিক হতে পারে না। সুতরাং প্রকৃত সত্য কথা হলো, মানুষ যত বড়ো বুদ্ধিমানই হোক, সে আসলে অক্ষম এবং তার জ্ঞান যতই বিস্তৃত হোক, তা সীমিত। অতএব মানুষের পক্ষে এমন বিধান রচনা অসম্ভব যা পৃথিবীর সকল মানুষের কাছে গ্রহণযোগ্য, সকল মানুষের জন্য কল্যাণকর ও উপযোগী এবং সকল জাতির সুখ-শান্তির নিশ্চয়তাদায়ক।

২. ইসলামী শরীআহ চারিত্রিক নৈতিকতার ওপর গুরুত্ব আরোপ করে : ইসলামী শরীআহ এর দৃষ্টিতে রাষ্ট্রের সুষ্ঠু পরিচালনা, ব্যক্তি ও সমষ্টির সার্বিক কল্যাণ এবং জান, মাল ও ইজ্জত-আব্রুর হেফাযতের জন্য সর্বাধিক গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হচ্ছে আখলাক। এজন্যই রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, 'আমাকে উত্তম চরিত্রের পরিপূর্ণতা সাধনের জন্যই প্রেরণ করা হয়েছে।'[২০] তাই ইসলামী শরীআহ এর যাবতীয় হুকুম-আহকাম চারিত্রিক মূলনীতি ও নৈতিকতার সঙ্গে সঙ্গতিপূর্ণ। যারা তাদের আচার-ব্যবহারে, কর্মে ও জীবনের পথ পরিক্রমায় চারিত্রিক সততার দাবি অনুযায়ী চলে, ইসলামী শরীআহ তাদের সাওয়াব ও পুরস্কারের ব্যবস্থা করে। আর যারা এর বিপরীত পথে চলে ইসলামী শরীআহ দুনিয়া ও আখেরাতে তার জন্য ব্যবস্থা করেছে যথার্থ শাস্তির। অন্যদিকে মানব রচিত আইনে এদিকের প্রতি কোন গুরুত্বই নেই। উদাহরণস্বরূপ বলা যায়, চারিত্রিক অধপতন হিসেবে বিবেচিত হওয়া সত্ত্বেও মানব রচিত আইনে যিনা-ব্যভিচারের শাস্তি মাত্র দুটো অবস্থাতেই দেয়া হয়।

ক. যখন জবরদস্তিমূলক ব্যভিচারে বাধ্য করা হয়।

খ. যখন একপক্ষের সম্মতি ও অপর পক্ষের অসম্মতি থাকে।

এছাড়া অন্য সকল অবস্থায় ব্যভিচারের শাস্তির কোন ব্যবস্থা মানব রচিত আইনে নেই। মদ্যপান, সমকামিতা ইত্যাদি আরো অনেক ক্ষেত্রে একই কথা প্রযোজ্য। অথচ ইসলামী শারীআতে এসব কিছুই পুরোপুরি নিষিদ্ধ ও আইনত দণ্ডনীয়।

৩. ইসলামী শরীআহ এর দৃষ্টিতে আল্লাহ ও তাঁর দেয়া বিধানের প্রতি সঠিক আকীদা পোষণ হচ্ছে সমাজে শান্তি-শৃংখলা প্রতিষ্ঠার সবচেয়ে বড় উপাদান এবং ব্যক্তি ও সমষ্টির কল্যাণ সাধনের মৌল ভিত্তি। কেননা তাকওয়াই শুধু সমাজের সকল মানুষকে সততা ও সত্যের পথে পরিচালিত করতে পারে এবং অন্যায়-অবিচার ও জুলুম থেকে রক্ষা করতে পারে। পক্ষান্তরে মানব রচিত কোন আইনেই স্রষ্টার প্রতি মানুষের আস্থা ও বিশ্বাস স্থাপনের কোন বাধ্যবাধকতা নেই। ফলে সে আইন সমাজ থেকে সকল অন্যায় ও অবিচার দূর করতে অক্ষম।

ইসলামী শরীআহ এর উদ্দেশ্য ও লক্ষ

ইসলামী শরীআহ এর উদ্দেশ্য ও লক্ষকে আরবীতে বলা হয় 'মাকাসিদ আশ্-শরীআহ'। শরীআহ' এর উদ্দেশ্য ও লক্ষ গভীরভাবে হৃদয়ঙ্গম করার জন্য এর আরবী পরিভাষাটির কিছুটা বিশ্লেষণ প্রয়োজন।

'মাকাসিদ আশ্-শরীআহ' শিরোনামটিতে দু'টি শব্দ রয়েছে। একটি হচ্ছে মাকাসিদ, যা মাকসাদ শব্দের বহুবচন। আরবীতে মাকসাদ শব্দটির একাধিক আভিধানিক অর্থ রয়েছে, তন্মধ্যে প্রধানতম অর্থ হচ্ছে ইচ্ছা ও উদ্দেশ্য।[২১] বাংলায় বলা হয় 'মনযিলে মাকসূদ' অর্থাৎ গন্তব্যস্থল, যার উদ্দেশ্যে মানুষ যাত্রা করে থাকে। এদিক থেকে মাকসাদ ও মাকসূদ শব্দদ্বয়ের অর্থ প্রায় একই। আরেকটি শব্দ হচ্ছে শরীআহ। ইতোপূর্বে 'শরীআহ' এর সংগা দেয়া হয়েছে। 'মাকাসিদ আশ্-শরীআহ' ইসলামী আইন বিষয়ক জ্ঞানের একটি সমৃদ্ধ শাখা, যা স্বয়ংসম্পূর্ণ একটি শাস্ত্র হিসাবে আজ মুসলিম বিশ্বের বিশ্ববিদ্যালয়সমূহে পঠিত হচ্ছে। সেজন্য 'ইসলামী শরীআহ এর উদ্দেশ্য ও লক্ষ' কথাটির বদলে এ প্রবন্ধে আমরা 'মাকাসিদ আশ্-শরীআহ' কথাটিই বেশি ব্যবহার করবো।

'মাকাসিদ আশ্-শরীআহ' এর পারিভাষিক সংগা : পূর্ববর্তী মুসলিম পণ্ডিতগণ 'মাকাসিদ আশ্-শরীআহ এর কোন সূক্ষ্ম পারিভাষিক সংগা প্রদান করেননি, যদিও বিষয়টি তাদের অনেকেরই জানা ছিল। তাঁরা 'মাকাসিদ আশ্-শরীআহ' এর নানা বিষয়, যেমন হিকমাত বা প্রজ্ঞা, ইললাত বা কারণ, মাসালিহ বা কল্যাণ এবং মাফাসিদ বা অকল্যাণ প্রভৃতি সম্পর্কে বিভিন্ন গ্রন্থে আলোচনা করেছেন। শরীআহ এর বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্ত গ্রহণে তারা 'মাকাসিদ আশ্-শরীআহ' এর প্রতি লক্ষ রেখেছেন।[২২] পরবর্তী সময়ে মুসলিম পণ্ডিতগণ ইসলামী জ্ঞানের সকল শাখা-প্রশাখার সংগা প্রদানে ব্রতী হন। তারই অংশ হিসেবে 'মাকাসিদ আশ্-শরীআহ' এর একাধিক সংগা তারা দিয়েছেন। নিচে উল্লেখযোগ্য কয়েকটি সংগা উল্লেখ করা হলো :

১. তিউনিসিয়ার প্রখ্যাত মুসলিম পণ্ডিত মুহাম্মাদ তাহির ইবনু আ'শূর বলেন, 'ব্যাপকার্থে মাকাসিদ আশ্-শরীআহ হচ্ছে সেসব উদ্দেশ্য ও হিকমাত, শরীআহ এর সকল কিংবা অধিকাংশ হুকুমের ক্ষেত্রে আল্লাহ যেগুলোর প্রতি লক্ষ রেখেছেন।'[২৩]

২. প্রফেসর ড. আহমাদ রাইসূনী বলেন, 'সকল বান্দার উপকারার্থে যেসব লক্ষ বাস্তবায়নের জন্য শরীআহ প্রণয়ন করা হয়েছে তাই হলো মাকাসিদ আশ্-শরীআহ।'[২৪]

৩. ড. মুহাম্মদ সা'দ আল-ইয়ূবী মাকাসিদ আশ্-শরীআহ এর সংগায় বলেন, 'মাকাসিদ হচ্ছে সেই সকল উদ্দেশ্য, তাৎপর্য ও হিকমাত, শরীআহ প্রণয়নের সময় সকল বান্দার কল্যাণ সাধনের জন্য সাধারণভাবে ও বিশেষভাবে যেগুলোর প্রতি আল্লাহ গুরুত্ব আরোপ করেছেন।'[২৫]

এ সংগাগুলো খুবই কাছাকাছি। এগুলোর আলোকে সংক্ষেপে বলা যায়, মাকাসিদ আশ্-শরীআহ হচ্ছে সেই সকল কল্যাণমুখী লক্ষ ও উদ্দেশ্যের সমষ্টি, শরয়ী হুকুম মেনে চলার মাধ্যমে বান্দাদের জন্য যা অর্জিত হওয়ার ইচ্ছা আল্লাহ করে থাকেন।

উদাহরণ : মাকাসিদ আশ্-শরীআহ এর উদাহরণ ছড়িয়ে ছিটিয়ে আছে শরীআহ এর বিভিন্ন হুকুম-আহ্কাম ও বিষয়সমূহে। ইবাদাত, মুয়ামালাত, বিবাহ্-শাদী, অপরাধ আইন ও কাফফারা প্রভৃতি সকল অধ্যায়েই শরীআহ এর উদ্দেশ্য বর্ণিত আছে। সন্দেহ নেই যে, শরীআহ এর প্রতিটি হুকুম ও শিক্ষা প্রণীত হয়েছে এমন সব কল্যাণকে সামনে রেখে যার সুফল বান্দা দুনিয়া ও আখিরাতে লাভ করে থাকে। এ সকল উদ্দেশ্য ও কল্যাণের অনেকগুলো আল-কুরআনে উক্ত হয়েছে, আবার বেশ কিছু উল্লেখ করা হয়েছে রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সুন্নাহে এবং কিছু কুরআন ও সুন্নাহের মূলনীতির আলোকে উদ্ভাবন করেছেন আলেম, তাফসীরকারক ও মুজতাহিদগণ।[২৬] সেসবের কিছু উদাহরণ নিচে উল্লেখ করা হলো।

০ উযু ও গোসলের বিধান দেয়া হয়েছে সালাত ও তাওয়াফ সম্পাদনের জন্য এবং প্রত্যেক মুসলমানের পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতা নিশ্চিত করার জন্য, যাতে একটি পরিচ্ছন্ন সভ্য মানব সমাজ প্রতিষ্ঠিত হয়, যা সকল জাতির মধ্যে ফুলের মত সৌন্দর্যের আধার হয়ে বিরাজ করবে।

০ জামায়াতবদ্ধ সালাত ও জুমআহ এর সালাতের বিধান এসেছে মহান আল্লাহর স্মরণকে জাগরুক করার জন্য, মুসলমানদেরকে সত্য, সততা ও পারস্পরিক সম্প্রীতির বন্ধনে আবদ্ধ করার জন্য এবং ঈমান-আকীদাকে নবায়ন করা, সহীহ্ জ্ঞানার্জন করা ও ইবাদতকে বিশুদ্ধ পন্থায় আদায় করার জন্য।

০ সালাতের উদ্দেশ্যে আযানের বিধান দেয়া হয়েছে এবং মানুষকে আল্লাহর ইবাদতের উদ্দেশ্যে একত্র করার জন্য। বস্তুত আযান হচ্ছে মানুষের বাস্তব জীবনে ইসলামের নীতি ও আদর্শ প্রচারের একটি শক্তিশালী মাধ্যম এবং আল্লাহর বড়ত্ব, মহত্ব ও সার্বভৌম ক্ষমতা প্রকাশের একটি উত্তম পন্থা।

০ পাঁচ ওয়াক্ত সালাত আদায়ের বিধান দেয়া হয়েছে আল্লাহর ইবাদত করার জন্য, দিনে পাঁচবার তাঁর সাথে সম্পর্ক নবায়ন করে অব্যাহত ও আনুগত্যের উপর নিজেকে অভ্যস্ত করার জন্য, অলসতা ঝেড়ে ফেলে সময়ানুবর্তিতা ও শৃংখলার অনুসারী হওয়ার জন্য এবং সালাত আদায়কারীকে দুনিয়ার সকল কষ্ট, জীবনের নানাবিধ সমস্যা ও শয়তানের প্ররোচণা থেকে মুক্তি দেয়ার জন্য।

০ শূকর, মৃতদেহ ও রক্তের ন্যায় অপবিত্র ও নিকৃষ্ট বস্তুসমূহ মুসলমানদের উপর হারাম করার পেছনে প্রধান উদ্দেশ্য হচ্ছে আল্লাহর আনুগত্য ও আদেশ পালন এবং শারীরিক, মনস্তাত্ত্বিক ও সামাজিক বিপর্যয় ও ক্ষতি পরিহার। সাম্প্রতিক কালে বিভিন্ন পরীক্ষায় দেখা গেছে, এ সকল হারাম ও নিকৃষ্ট বস্তু মানব শরীরের জন্য অত্যন্ত ক্ষতিকর।

০ সমাজে সবার মধ্যে ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠার নির্দেশ এ জন্যই দেয়া হয়েছে যাতে, প্রত্যেক ব্যক্তি নিজ নিজ অধিকার ভোগ করতে পারে এবং সমাজের ফিতনা-ফাসাদ ও বিবাদ-বিসম্বাদ দূরীভূত হয়। আর মানুষ যেন আইন-শৃংখলার পথে অধিকার অর্জনে অগ্রসর হয়।

০ বিবাহ-শাদী, নানাবিধ ব্যবসা-বাণিজ্য ও অন্যান্য অনেক মুয়ামালাত ইসলামী শারীআতে বৈধ করা হয়েছে মানুষের জীবনধারণকে সহজতর করার জন্য এবং মানুষের জরুরি ও প্রয়োজনীয় লেনদেনকে সহজ করে মানুষের জীবনযাত্রাকে সমৃদ্ধ ও সুন্দর করার জন্য। এভাবে ইসলামী শরীআহ এর সকল বিধানেই নিহিত রয়েছে বিশেষ উদ্দেশ্য, লক্ষ ও কারণ।

'মাকাসিদ আশ্-শরীআহ' এর দলীল-প্রমাণ

আল-কুরআনে 'মাকাসিদ আশ্-শরীআহ' তথা ইসলামী শরীআহ এর উদ্দেশ্য ও লক্ষ বিভিন্ন পদ্ধতি ও পন্থায় পেশ করা হয়েছে। নিম্নে তার কিছু উল্লেখ করা হলো :

১. আল্লাহ কুরআনের বহু জায়গায় উল্লেখ করেছেন যে, তিনি হাকীম, প্রজ্ঞাবান। আল্লাহ বলেন, 'এটি প্রজ্ঞাবান প্রশংসিত আল্লাহর নিকট হতে নাযিলকৃত।'[২৭] তিনি অন্যত্র বলেন, 'এটি পরাক্রমশালী ও প্রজ্ঞাময় আল্লাহর কাছ থেকে নাযিলকৃত গ্রন্থ।'[২৮] এ কথার অনিবার্য দাবি হলো, তাঁর প্রণীত প্রতিটি বিধানের অবশ্যই একটি হিকমত ও উদ্দেশ্য রয়েছে এবং কোন কিছুই তিনি অনর্থক ও উদ্দেশ্যহীনভাবে প্রচলন করেননি।

২. আল্লাহ কুরআনের একাধিক স্থানে নিজেকে সবচেয়ে দয়ালু ও করুণাময় বলে উল্লেখ করেছেন। 'আর আমার দয়া প্রতিটি বস্তুতে ব্যাপ্ত রয়েছে।'[২৯] একটি দুআয় তিনি এভাবে বলতে শিখিয়ে দিয়েছেন, 'হে আমাদের রব! আমরা ঈমান এনেছি, অতএব আমাদের ক্ষমা করুন এবং আমাদেরকে রহম করুন। আপনিই তো সর্বোত্তম দয়ালু।'[৩০] আর মানুষের প্রতি তাঁর করুণা হচ্ছে, তাদের জন্য এমন সকল বিধান প্রণয়ন যা তাদের জন্য কল্যাণকর। এ প্রসঙ্গে ইমাম ইবনুল কাইয়েম শিফাউল আলীল গ্রন্থে বলেন, 'তাঁর হিকমত ও তাঁর উদ্দেশ্যকে অস্বীকার করার অর্থ হলো প্রকৃতপক্ষে তাঁর রহমত ও দয়াকে অস্বীকার করা।'[৩১]

৩. কুরআনের বহু স্থানে আল্লাহ বলেছেন যে, তিনি এই কাজ এই এই উদ্দেশ্যে করেছেন। যেমন তিনি বলেন, 'আর অনুরূপভাবে আমি তোমাদেরকে মধ্যমপন্থাবলম্বী জাতি করে দিয়েছি, যাতে তোমরা সকল মানুষের উপর সাক্ষী এবং রসূল তোমাদের উপর সাক্ষী....।'[৩২] তিনি আরো বলেন, 'নিশ্চয় আমি আপনার প্রতি সত্য সহকারে কিতাব নাযিল করেছি যাতে আপনি মানুষের মধ্যে মীমাংসা করেন যা আল্লাহ আপনাকে দেখিয়েছেন তার দ্বারা।'[৩৩]

৪. কুরআনের অনেক স্থানে শরীআহ এর ব্যাপক লক্ষ ও উদ্দেশ্যের কথা বর্ণিত হয়েছে আবার কোথাও সুনির্দিষ্ট উদ্দেশ্য বর্ণিত হয়েছে। যেমন দীনের সকল ক্ষেত্রে কঠোরতা বিলোপ ও অসুবিধা দূরীকরণ উদ্দেশ্য। আল্লাহ বলেন, 'তিনি দীনের মধ্যে তোমাদের উপর কোন কঠোরতা আরোপ করেননি।'[৩৪]

আর কুরআনে সুনির্দিষ্টভাবে জিহাদ, সালাত, সিয়াম, যাকাত, হজ্জ প্রভৃতি ইবাদতসমূহের উদ্দেশ্য উল্লেখ করা হয়েছে। যেমন সালাত সম্পর্কে বলা হয়েছে, 'এবং আমাকে স্মরণ করার জন্য সালাত কায়েম করো।'[৩৫] সিয়াম সম্পর্কে বলা হয়েছে, 'যাতে তোমরা তাকওয়া অর্জন করতে পারো।'[৩৬]

শরীআহ-এর লক্ষসমূহ চেনার উপায়

ইতোপূর্বে উল্লেখ করা হয়েছে যে, শরীআহ এর প্রতিটি হুকুমে নিহিত রয়েছে একটি বিশেষ লক্ষ ও উদ্দেশ্য। এখন প্রশ্ন হচ্ছে কিভাবে সে সম্পর্কে নিশ্চিত হওয়া যায় যে, এটি শরীআহ এর উদ্দেশ্য। প্রকৃতপক্ষে কোন একটি বিষয়কে শরীআহ প্রণেতার উদ্দেশ্য বলে দাবি করা কিংবা উদ্দেশ্য নয় বলে ঘোষণা করা অত্যন্ত কঠিন। এর জন্য প্রয়োজন ধীরস্থিরতার সাথে গভীর চিন্তা-ভাবনা, বিশুদ্ধ নিয়ম-প্রণালীর অনুসরণ এবং সেসব সুস্পষ্ট উপায় ও পন্থাসমূহ সুনির্দিষ্ট করা যদ্বারা সেগুলোকে সহজেই চেনা যাবে। এ ধরনের উপায় হচ্ছে পাঁচটি।[৩৭]

১. **গবেষণাভিত্তিক অনুসন্ধান :** শরীআহ এর সকল দলীল ও হুকুম-আহকাম অনুসন্ধান করে জানা যায়, মানব জীবনের সর্বাধিক গুরুত্বপূর্ণ বিষয়সমূহ (আদ্-দারূরিয়্যাত) সর্বমোট পাঁচটি : দীন, প্রাণ বা জীবন, বিবেক-বুদ্ধি, সম্পদ ও বংশধারার হেফাযত। অতএব সহজেই এ সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়া যায় যে, এ পাঁচটি বিষয়ের হেফাযত ও সংরক্ষণ শরীআহ প্রণেতার অন্যতম উদ্দেশ্য।

২. **শারয়ী' নির্দেশ ও নিষেধাজ্ঞাসমূহের কারণ অনুসন্ধান :** ইসলামী শারীআতে যে সকল নির্দেশ কিংবা নিষেধাজ্ঞা জারি করা হয়েছে এবং এক্ষেত্রে যে কারণ উল্লেখ করা হয়েছে তার দ্বারা শরীআহ এর উদ্দেশ্য সম্পর্কে সম্যক ধারণা পাওয়া যায়। যেমন আল্লাহ বলেন, 'হে মানবমণ্ডলী! তোমরা তোমাদের সেই প্রতিপালকের ইবাদত করো যিনি তোমাদেরকে ও তোমাদের পূর্ববর্তীদেরকে সৃষ্টি করেছেন যাতে তোমরা মুত্তাকী হতে পারো।'[৩৮]

'আর আমি আপনার উপর কিতাব নাযিল করেছি স্পষ্ট ব্যাখ্যাস্বরূপ হেদায়াত, রহমত ও সুসংবাদস্বরূপ।'[৩৯]

'আল্লাহ জনপদবাসীদের নিকট হতে তাঁর রসূলকে যা কিছু দিয়েছেন তা আল্লাহর, তাঁর রসূলের, রসূলের স্বজনদের, ইয়াতীমদের, অভাবগ্রস্ত ও পথচারীদের, যাতে তোমাদের মধ্যে যারা বিত্তবান কেবল তাদের মধ্যেই সম্পদ আবর্তন না করে।'[৪০]

রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, 'মদীনায় আগমনকারী ভ্রমণ কাফেলার কারণেই আমি তোমাদেরকে (কুরবানীর গোশত মজুদ করতে) নিষেধ করেছিলাম। তবে এখন তোমরা তা ভক্ষণ করতে পার, মজুদ করতে পার এবং সদকা করতে পার।'[৪১]

৩. **সুস্পষ্ট নির্দেশ কিংবা নিষেধাজ্ঞা :** এ থেকে বুঝা যায় যে, নির্দেশটি কার্যে পরিণত করা হোক এবং নিষিদ্ধ বিষয় থেকে বিরত থাকা হোক– এটাই শরীআহ প্রণেতার উদ্দেশ্য। অতএব কেউ যদি শরীআহ এর নির্দেশ বাস্তবায়ন না করে কিংবা নিষেধাজ্ঞা অমান্য করে নিষিদ্ধ কাজে লিপ্ত হয়, তাহলে সে শরীআহ এর লক্ষ ও উদ্দেশ্যের বিরোধিতা করলো।

৪. **যে বক্তব্য থেকে সরাসরি উদ্দেশ্য সম্পর্কে জানা যায় :** এ ধরনের বক্তব্যের মধ্যে রয়েছে যেখানে শরীআহ প্রণেতা স্বয়ং তার ইচ্ছার কথা ব্যক্ত করেছেন। যেমন আল্লাহর বাণী, 'আল্লাহ তোমাদের জন্য যা সহজ তা চান এবং যা তোমাদের জন্য ক্লেশকর তা চান না।'[৪২] তিনি আরো বলেন, 'আল্লাহ ইচ্ছা করেন তোমাদের কাছে বিশদভাবে বিবৃত করতে, তোমাদের পূর্ববর্তীদের

রীতি-নীতি তোমাদেরকে অবহিত করতে এবং তোমাদেরকে ক্ষমা করতে। আল্লাহ সর্বজ্ঞ, প্রজ্ঞাময়। আল্লাহ তোমাদেরকে ক্ষমা করতে চান, আর যারা কুপ্রবৃত্তির অনুসরণ করে তারা চায় যে, তোমরা ভীষণভাবে পথভ্রষ্ট হও।'[৪৩]
'আল্লাহ তোমাদেরকে কষ্ট দিতে চান না, বরং তিনি তোমাদেরকে পবিত্র করতে চান..... ।'[৪৪]
এ ধরনের বক্তব্যের মধ্যে আরো রয়েছে– কোন কিছু নির্ধারণ করে দেয়া, ফরয করা, নির্দেশ প্রদান করা, অনুমতি দেয়া, হারাম করা ইত্যাদি। যেমন আল্লাহ বলেন, 'তোমার প্রতিপালক আদেশ দিয়েছেন তিনি ব্যতীত অন্য কারো ইবাদত না করতে এবং পিতা-মাতার প্রতি সদ্ব্যবহার করতে।'[৪৫]
'এটাই আল্লাহর বিধান যিনি তোমাদের মধ্যে ফয়সালা করে থাকেন।'[৪৬]
'হে ঈমানদারগণ! তোমাদের উপর সিয়াম ফরয করা হয়েছে।'[৪৭]
'আল্লাহ নির্দেশ প্রদান করছেন ন্যায়পরায়ণতা ও সদাচরণের.... ।' [সূরা আন-নাহল : ৯০]
এ সকল বক্তব্যের মধ্যে আরো রয়েছে– কল্যাণকর, অকল্যাণকর কিংবা উপকারী বা ক্ষতিকর অথবা প্রিয় বা অপ্রিয় বলে উল্লেখ করা। যেমন আল্লাহ বলেন, 'আর সাওম পালন তোমাদের জন্য কল্যাণকর'।[৪৮]
'তোমরা যদি অপছন্দ কর তবে এমন হতে পারে যে, আল্লাহ তাতে প্রভূত কল্যাণ রেখেছেন।'[৪৯]
৫. নির্দেশ দান বা নিষেধ করার বাস্তব কারণ বিদ্যমান থাকা সত্ত্বেও শরীআহ্ প্রণেতার নীরবতা অবলম্বন। যদি প্রয়োজনীয় কার্যকারণ বিদ্যমান থাকা সত্ত্বেও শরীআহ্ এর নির্দেশ না আসে তাহলে বুঝতে হবে উক্ত কাজে শরীআহ্ এর অনুমোদন নেই। আবার নিষেধ করার যথার্থ কারণ ও উপলক্ষ বিদ্যমান থাকা সত্ত্বেও যদি শরীআহ্ কর্তৃক নিষেধাজ্ঞা আরোপিত না হয় তাহলে বুঝতে হবে কাজটি শরীআহ্ এর দৃষ্টিতে নিষিদ্ধ নয়।

শরীআহ্ এর উদ্দেশ্যের শ্রেণীবিভাগ

আমরা জানি ইসলামী শরীআহ এর প্রতিটি বিধানেরই রয়েছে বিশেষ উদ্দেশ্য। শরীআহ্ এর এ সকল উদ্দেশ্যকে তিনটি ভাগে ভাগ করা যায়, যার প্রতিটির রয়েছে আলাদা আলাদা উপ-বিভাগ।[৫০]

প্রথম প্রকরণ : মৌলিকত্বের দিক থেকে শরীআহ্-এর উদ্দেশ্য দু'প্রকার :

১. **মৌলিক উদ্দেশ্য** : এ দ্বারা শরীআহ্ এর প্রাথমিক উদ্দেশ্য বুঝানো হয়েছে অর্থাৎ শরীআত প্রণেতা কোন নির্দেশ দ্বারা প্রথম যে উদ্দেশ্য নির্ধারণ করেছেন তা বুঝানো হয়েছে। যেমন সালাত আদায়ের যে নির্দেশ দেয়া হয়েছে তার মৌলিক উদ্দেশ্য হচ্ছে আল্লাহর আনুগত্য, স্মরণ এবং অন্যায় ও অশ্লীলতা থেকে মুক্তি।

২. **গৌণ বা আনুষঙ্গিক উদ্দেশ্য** : যেসব উদ্দেশ্য মৌলিক উদ্দেশ্যের সাথে অর্জিত হয় বা তার সহায়করূপে উদ্ভূত হয় সেগুলো হচ্ছে গৌণ বা আনুষাঙ্গিক উদ্দেশ্য। যেমন সালাত আদায়ের মাধ্যমে শারীরিক-মানসিক প্রশান্তি লাভ, উযূর মাধ্যমে পরিচ্ছন্নতা অর্জন ইত্যাদি।

দ্বিতীয় প্রকার : ব্যাপকতার দিক থেকে শরীআহ্-এর উদ্দেশ্য তিন প্রকার :

১. **ব্যাপক উদ্দেশ্য :** ইসলামী শরীআহ্ এর সকল ক্ষেত্রে ও সকল অধ্যায়ে যে সকল উদ্দেশ্য বাস্তবায়নের প্রতি লক্ষ্য রাখা হয়েছে, সেগুলো হচ্ছে ব্যাপক উদ্দেশ্য। যেমন ঃ

ক. কল্যাণ সাধন এবং অকল্যাণ ও ক্ষতি প্রতিহতকরণ,

খ. সহজীকরণ ও কঠোরতা বিলোপ ইত্যাদি।

২. **নির্দিষ্ট উদ্দেশ্য :** শরীআহ্ এর নির্দিষ্ট অধ্যায় ও বিষয়ভিত্তিক যে সুনির্দিষ্ট লক্ষ ও উদ্দেশ্য রয়েছে সেগুলোকে বলা হয় নির্দিষ্ট উদ্দেশ্য। যেমন সালাতের উদ্দেশ্য, সাওম ও হজ্জের উদ্দেশ্য ইত্যাদি।

৩. **ক্ষুদ্র উদ্দেশ্য :** শরীআহ্ এর যে সকল উদ্দেশ্য শুধুমাত্র কোন একটি নির্দিষ্ট মাসআলার সাথে সংশ্লিষ্ট থাকে, তাকে বলা হয় ক্ষুদ্র উদ্দেশ্য। যেমন উযুর সময় নাকে পানি দেয়ার উদ্দেশ্য কিংবা সালাতে রুকূ আদায়ের উদ্দেশ্য ইত্যাদি।

তৃতীয় প্রকার : মানুষের কল্যাণ সাধনের যে উদ্দেশ্যে শরীআহ্ প্রণীত হয়েছে সেদিক থেকে তা তিন প্রকার :

১. মানব জীবনের সর্বাধিক গুরুত্বপূর্ণ বিষয়সমূহ (আদ্-দারূরিয়্যাত)

২. মানব জীবনের প্রয়োজনসমূহ (আল-হাজিয়্যাত)

৩. মানব জীবনের শোভাবর্ধণকারী বিষয়সমূহ (আত-তাহসীনিয়্যাত)।

শরীআহ্ এর উদ্দেশ্যের দৃষ্টিতে মানব জীবনের সর্বাধিক প্রয়োজনীয় বিষয়সমূহ (আদ-দারূরিয়্যাত)

মহান রব্বুল আলামীন মানব জাতির সার্বিক কল্যাণ সাধনের জন্যই ইসলামী শরীআহ্ এর সকল বিধান প্রণয়ন করেছেন। মানব জীবনের সর্বাধিক জরুরি বিষয়সমূহের সংরক্ষণ ও হেফাযত সে বিধানেরই এক গুরুত্বপূর্ণ অংশ। ইসলামী শরীআহ্ এর পরিভাষায় এ বিষয়সমূহের নাম দেয়া হয়েছে 'আদ-দারূরিয়্যাত' বা সর্বাধিক প্রয়োজনীয় বিষয়।

'আদ-দারুরিয়্যাত' এর সংগা : ইমাম শাতিবী র. এর সংগায় বলেন, 'আদ-দারূরিয়্যাত হচ্ছে দীন ও দুনিয়ার সে সকল অত্যাবশ্যকীয় বিষয়সমূহ যার অনুপস্থিতিতে দুনিয়ার কল্যাণের সঠিক গতিধারা ব্যাহত হয়, বরং এ ক্ষেত্রে দেখা দেয় বিপর্যয়, সীমাহীন ক্ষতি ও প্রাণ হারানোর ঘটনা। আর আখিরাতে নাজাত ও নেয়ামত লাভ হয় সুদূর পরাহত এবং ক্ষতি হওয়া অবধারিত হয়ে যায়।'[৫১]

প্রখ্যাত মুসলিম পণ্ডিত আল-মহাল্লী বলেন, 'যে সব বিষয় অতি প্রয়োজনীয় সেগুলো হচ্ছে আদ-দারূরিয়্যাত।'[৫২]

'আদ-দারুরিয়্যাত' পাঁচটি।[৫৩] সেগুলো হল :

০ দীনের হেফাযত

০ জীবনের হেফাযত

০ আকল বা বিবেকের হেফাযত

০ বংশধারার হেফাযত

০ সম্পদের হেফাযত

এ পাঁচটি বিষয়কে বলা হয় আল-মাকাসিদ আল-খামসাহ্ বা শরীআহ্ এর পাঁচটি উদ্দেশ্য। এগুলোর নিরাপত্তা ছাড়া পৃথিবীতে মানব জীবন কোনভাবেই চলতে পারে না। আর এজন্যই দীন, জীবন, আকল, সম্পদ এবং বংশধারার হেফাযত ইসলামী শরীআহ্ এর একটি মৌলিক উদ্দেশ্য। এ পাঁচটি বিষয়ের মধ্যে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ হচ্ছে দীন, তারপর মানুষের জীবন, তারপর তার আকল, বংশধারা এবং সর্বশেষ সম্পদ।

প্রথম বিষয় : দীনের হেফাযত

বাংলা ভাষায় দীনকে সচরাচর আমরা ধর্ম বলে থাকি, যদিও আল-কুরআনে 'দীন' বলতে নিছক ধর্ম বুঝানো হয়নি। আল-কুরআনে 'দীন' মানব জীবনের প্রতিটি বিষয়ে সমাধান প্রদান করে থাকে। সেখানে মানুষের সামগ্রিক জীবনই দীনের গণ্ডীভুক্ত। ধর্মীয় জীবন সেখানে মানুষের পুরো জীবন থেকে বিচ্ছিন্ন কোন অংশ নয়।

মানুষ স্বভাবতই কোন না কোন ধর্মের অনুসারী হয়ে থাকে, চাই সে ধর্ম সত্য হোক বা বাতিল। এর বাইরে অবস্থান রয়েছে খুবই কম মানুষের। এখানে দীন বলতে যে কোন ধর্মকে বুঝানো হয়নি, বরং সে সত্য দীনকে বুঝানো হয়েছে যা মহান রব্বুল আলামীনের নাযিলকৃত তথা ইসলাম। কেননা মানব রচিত কোন ধর্ম আল্লাহর কাছে গ্রহণযোগ্য নয়, আবার অন্যান্য আসমানী দীনসমূহ সর্বশেষ দীন ইসলাম দ্বারা রহিত হয়ে গেছে। মহান আল্লাহ্ বলেন, 'নিশ্চয় আল্লাহর নিকট একমাত্র দীন হচ্ছে ইসলাম।'[৫৪]

'যে ব্যক্তি ইসলাম ছাড়া অন্য কোন দীন অনুসন্ধান করে, আল্লাহ্ কখনো তার কাছ থেকে তা কবুল করবেন না। সে আখিরাতে ক্ষতিগ্রস্তদের অন্তর্ভুক্ত হবে।'[৫৫]

দীনের হেফাযতের উপায়

মহান আল্লাহ্ নিজেই এ দীনকে হেফাজত করার দায়িত্ব নিয়েছেন। তিনি বলেছেন, 'নিশ্চয় আমি এ উপদেশ নাযিল করেছি এবং আমিই তার হেফাযতকারী।'[৫৬] উপদেশ বলতে এ আয়াতে কুরআন এবং দীন উভয়টিকেই বুঝানো হয়েছে। দীনকে হেফাযতের জন্য আল্লাহ্ যে সকল পন্থা ও উপায় অবলম্বনের নির্দেশ দিয়েছেন তা হচ্ছে :

১. **দীনের নির্দেশনা অনুযায়ী আমল করা :** আল্লাহ্ এ দীন প্রবর্তন করেছেন তদানুযায়ী আমল করার জন্য, শুধু দীনের কিছু বাচন ও উক্তি হেফাযত উদ্দেশ্য নয়। কেননা দীন হচ্ছে আকীদা-বিশ্বাস ও বাস্তব কর্মের সমন্বয়। আর কাজে পরিণত করা ছাড়া দীনের সুফল পাওয়া যায় না। প্রত্যেক মুসলিম বাস্তব জীবনে দীনকে বাস্তবায়ন করতে সক্ষম হলে অচিরেই তার সুফল দেখতে পায়। অতএব দীনের সুরক্ষার জন্য তদনুযায়ী আমল করা অত্যন্ত জরুরি। এজন্যই আল্লাহ্

তাআ'লা মানুষের উপর সালাত, সাওম, হজ্জ ও যাকাতসহ আরো অনেক আমল ফরয করেছেন। দীন অনুযায়ী আমলের একটি সর্বনিম্ন সীমা রয়েছে যা লংঘন করার অনুমতি কাউকে দেয়া হয়নি। তা হচ্ছে ফরয-ওয়াজিব মেনে চলা এবং হারাম পরিত্যাগ করা। ড. আবদুল্লাহ আহমাদ আল-কাদরী বলেন, 'আল্লাহ তাআ'লা মুসলমানদের প্রত্যেক ব্যক্তির উপর একটি সর্বনিম্ন সীমা নির্ধারণ করে দিয়েছেন যদ্বারা দীনের সুরক্ষা হয়ে থাকে। এগুলো হচ্ছে ফরযে আইন পর্যায়ে নির্দেশ প্রয়োজনীয় শক্তি-সামর্থ্য ও বুদ্ধিজ্ঞান অটুট থাকা অবস্থায় যা পালন থেকে কেউই অব্যাহতি পায় না। এর উদাহরণ হচ্ছে ঈমান ও ইসলামের মূলভিত্তিসমূহ। আল্লাহ প্রত্যেককেই ঈমান ও ইসলাম অনুযায়ী আমলের দায়িত্ব দিয়েছেন...।'[৫৭]

ইসলামের বিধিবিধান মানুষের জীবনে ফলপ্রসূ ও প্রভাবশালী করার জন্য প্রয়োজন আল্লাহর নির্দেশিত ও রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম প্রদর্শিত পন্থায় আমল করা। এভাবে আমল করতে পারলেই তা হবে প্রকৃত দীন। কিন্তু যখনই বাস্তবায়নে ত্রুটি দেখা দেবে এবং প্রকৃত দীন ও আমলে পার্থক্য সূচিত হবে তখন এ আমলকারীকে দীনের খাঁটি অনুসারী হিসাবে গণ্য করা যায় না। এখান থেকেই আমরা মুসলমান ও ইসলামের মধ্যে পার্থক্য উপলব্ধি করতে পারি। কেননা মুসলমানদের কাজ কখনো ঠিক হতে পারে কখনো ভুল হতে পারে, কখনো হক ও কখনো বাতিল হতে পারে, কিন্তু ইসলাম শুধুই হক ও সত্যাশ্রয়ী, এতে মিথ্যার কোন অবকাশ নেই। ফলে আজকের মুসলমানদের কাজকর্ম দীনের বিরুদ্ধে কোন দলীল হতে পারে না, বরং দীনের নির্দেশের আলোকেই সকলের কর্মধারা যাচাই করা হবে।

২. দীনের নির্দেশ অনুযায়ী রাষ্ট্রীয় কার্যাবলী পরিচালনা করা : দীনের নির্দেশ অনুযায়ী যাবতীয় কার্য পরিচালনা দীনের হেফাযতের একটি অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ পন্থা। কেননা দীনই যদি কার্য পরিচালনার মূল চালিকাশক্তি না হয় তাহলে সে দীন কিভাবে হেফাযত করা সম্ভব? দীনের হেফাযতের অর্থ শুধু কাগজে-কলমে কিংবা কিতাবে একে সংরক্ষণ করা নয়, বরং মানুষের যাবতীয় কর্মকাণ্ডে দীনের নির্দেশ মেনে চলাই হচ্ছে দীনের সবচেয়ে বড় হেফাযত।[৫৮]

অতএব দ্বীনকে জীবন থেকে বিচ্ছিন্ন করে আল্লাহ প্রদত্ত নির্দেশ ও কিতাব ছাড়া অন্য আইন দ্বারা সমাজ ও রাষ্ট্র পরিচালনা করার অর্থ দাঁড়ায় আল্লাহর দীন ও কিতাবের স্থলে মানব প্রবৃত্তি ও মতবাদকে গ্রহণ করা। দীনকে ধ্বংস করার জন্য এর চেয়ে আর বড় কোন হাতিয়ার আছে কি এবং দীনের বিরুদ্ধে কৃত এর চেয়েও বড় কোন অপরাধ আছে কি?

মহান আল্লাহ তাআ'লা বলেন, 'কখনো নয়, আপনার রবের শপথ! তারা ঈমানদার হবে না, যতক্ষণ না তারা তাদের মধ্যকার বিবাদ-বিসম্বাদের আপনার উপর অর্পণ করে, অতপর আপনি যে ফয়সালা করে দেন তাতে নিজেদের মনে কোনরূপ দ্বিধা না রেখে পুরোপুরি তা মেনে নেয়।'[৫৯] 'যারা আল্লাহ প্রদত্ত বিধান অনুযায়ী হুকুম প্রদান করে না তারা কাফির।'[৬০]

৩. দীনের প্রতি মানুষকে আহ্বান করা : দীনের প্রতি আহ্বান মূলত নবী ও রসূলগণেরই সুমহান কাজ। এ দায়িত্ব পালনের জন্যই তাঁরা জীবনভর সংগ্রাম করেছেন, কষ্ট করেছেন এবং সকল

বিপদে-আপদে চরম ধৈর্যের পরাকাষ্ঠা দেখিয়েছেন। প্রকৃতপক্ষে দাওয়াত ও আহ্বানের এ মহান দায়িত্ব পালন ব্যতীত কোন দীনকে প্রতিষ্ঠিত করা ও প্রসারিত করা সম্ভব নয়।

দেখা যায়, অনেকে তাদের নিজ নিজ মতবাদ বাতিল হওয়া সত্ত্বেও অন্যদের কাছে তা গ্রহণযোগ্য করে তোলার জন্য বিভিন্ন পন্থায় তা প্রচারে লিপ্ত। ইসলামের শত্রুরাও আজ ইসলামকে বিকৃতভাবে প্রচারের জন্য উঠে পড়ে লেগেছে। তাহলে মহান আল্লাহর দেয়া সত্যকে প্রচারের জন্য এবং বিশেষ করে একে শত্রুদের বিকৃতি থেকে রক্ষা করার জন্য দাওয়াতী কাজের প্রসার ঘটানো মুসলমানদের জন্য অত্যন্ত জরুরি। আল্লাহ্ তাআলা বলেন, 'তোমাদের মধ্যে যেন এমন একদল লোক থাকে যারা কল্যাণের দিকে আহ্বান করবে এবং সৎ কাজের নির্দেশ দেবে ও অসৎ কাজ থেকে নিষেধ করবে। তারাই হবে সফলকাম।'[৬১]

'তোমরাই শ্রেষ্ঠ উম্মাত, মানব জাতির জন্য তোমাদের আবির্ভাব হয়েছে। তোমরা সৎ কাজের নির্দেশ দিবে এবং অসৎ কাজ থেকে নিষেধ করবে ও আল্লাহর প্রতি ঈমান রাখবে।'[৬২]

'আর আপনার প্রভুর দিকে আহ্বান করুন এবং মুশরিকদের অন্তর্ভুক্ত হবেন না।'[৬৩] 'আপনার প্রভুর পথে হিকমাত ও উত্তম উপদেশ সহকারে আহ্বান করুন।'[৬৪] 'বলুন, এটাই আমার পথ। আল্লাহর দিকে মানুষকে আমি সজ্ঞানে আহ্বান করি এবং আমার অনুসারীগণও।'[৬৫]

৪. জিহাদ ফি সাবীলিল্লাহ : দীনকে হেফাযতের একটি অন্যতম উপায় হচ্ছে আল্লাহর পথে জিহাদ। জিহাদ একটি ব্যাপকার্থক শব্দ। ব্যাপকার্থে জিহাদ আল্লাহর দীন প্রতিষ্ঠার সাথে সম্পর্কিত সকল পর্যায়ের ও সকল প্রকারের কর্মকাণ্ডকেই বুঝায়। এ হিসাবে আল্লাহর দীনের প্রতি দাওয়াত জিহাদের প্রাথমিক পর্যায়। আর বিশেষ অর্থে আল্লাহর বাণীকে সমুন্নত করার জন্য, ইসলাম ও মুসলমানদেরকে ইসলামের শত্রুদের আক্রমণ থেকে রক্ষার জন্য ও ইসলামকে আল্লাহর যমীনে প্রতিষ্ঠার জন্য রাষ্ট্রপ্রধানের নেতৃত্বে যে যুদ্ধ পরিচালিত হয়ে থাকে তাকে জিহাদ বলা হয়। আল্লাহ তাআ'লা বলেন, 'নিশ্চয় আল্লাহ মুমিনদের নিকট হতে তাদের জীবন ও সম্পদ ক্রয় করে নিয়েছেন। বিনিময়ে তাদের জন্য আছে জান্নাত। তারা আল্লাহর পথে যুদ্ধ করে, নিধন করে ও নিহত হয়।'[৬৬]

৫. দীন বিরোধী সকল কথা ও কাজ প্রতিরোধ করা : এটিও মূলত জিহাদের অন্তর্গত। দীনের হেফাযতের জন্য বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ বিধায় একে আলাদাভাবে উল্লেখ করা হলো। কেননা যদি দীন বিরোধী বাতিল কথা, ভ্রান্ত আকীদা, ভ্রষ্ট চিন্তাধারা এবং ক্ষতিকর মতবাদসমূহকে কোন প্রকার বাদ-প্রতিবাদ ছাড়াই মুসলমানদের সমাজে আঘাত হানার সুযোগ করে দেয়া হয়, তাহলে দীনের মৌলিক ধারণা লোপ পেতে থাকবে, সত্যকে বাতিল ও মিথ্যার সাথে গুলিয়ে ফেলা হবে। ফলে ধীরে ধীরে দীন হতে মানুষ সরে যেতে থাকবে। তা যেন না হয় সেজন্য অতীতে যেমন বহু আলেম দীন সম্পর্কে সকল বিভ্রান্তি ও সংশয় অপনোদনের জন্য কলম ধরেছিলেন এবং সত্যের পক্ষে বাকযুদ্ধে লিপ্ত হয়েছিলেন, বর্তমানেও তেমনি মুসলিম স্কলারগণ বিভিন্নভাবে কাজ করছেন।

দ্বিতীয় বিষয় : জীবনের হেফাযত

মানব জীবনের সুরক্ষার প্রতি ইসলাম খুবই গুরুত্ব আরোপ করেছে। জীবনের সুরক্ষার জন্য এবং জীবনকে সকল ক্ষতি ও বিপর্যয় থেকে রক্ষার জন্য ইসলামে প্রণীত হয়েছে বহু হুকুম-আহকাম এবং দেয়া হয়েছে অনেক বিধিবিধান। জীবনের হেফাযতের উপায় হিসাবে বিবেচিত এ বিধানের মধ্যে রয়েছে :

১. মানুষের জীবনের উপর হস্তক্ষেপ করা হারাম।

২. হত্যাকাণ্ডের প্রতি প্রলুব্ধকারী সকল উপায়-উপকরণ নিষিদ্ধ।

৩. কিসাস (হত্যার শাস্তি) নির্ধারণ।

৪. কোন ব্যক্তি নিহত হলে হত্যাকারীর বিরুদ্ধে শাস্তি কার্যকর করার জন্য তার অপরাধ স্পষ্টভাবে প্রমাণ করা, যাতে নিরপরাধ কোন ব্যক্তি হত্যার শাস্তি না পায়।

৫. আক্রান্ত হওয়ার কারণে জীবনের যে সকল ক্ষতি হয়ে থাকে তার ক্ষতিপূরণ দিতে আক্রমণকারীকে বাধ্য করা।

৬. কিসাসের শাস্তি ক্ষমা করার বিধান।

৭. জীবন বাঁচানোর উদ্দেশ্যে অত্যন্ত নিরুপায় অবস্থায় নিষিদ্ধ বস্তু ভক্ষণের অনুমতি।

তৃতীয় বিষয় : আকল বুদ্ধি-বিবেকের হেফাযত

আকল বা বিবেক মানুষকে দেয়া আল্লাহর অন্যতম প্রধান নেয়ামত। মূলত আকলের মাধ্যমেই মানুষকে আর সব প্রাণীর উপর প্রাধান্য দেয়া হয়েছে এবং এর কারণেই মানুষের উপর তিনি শরীআহ অনুসরণের গুরুদায়িত্ব অর্পণ করেছেন। আকল বা বিবেককে সকল পর্যায় থেকে রক্ষা করার গুরুত্ব সকল যুগে সকল শরীআহ এর মধ্যেই ছিল। আল-কুরআনে মহান আল্লাহ বার বার বিবেক সম্পন্ন লোকদের সম্বোধন করেছেন এবং বিবেকবান লোকেদেরকে তাঁর নিদর্শনাবলী নিয়ে চিন্তা-গবেষণা করার নির্দেশ দিয়েছেন।

ইসলামে দু'ভাবে আকলকে হেফাযত করার দিকনির্দেশনা দেয়া হয়েছে

১. আকল নষ্টকারী বাহ্যিক উপকরণসমূহ থেকে একে হেফাযতে রাখা। এসব উপকরণের মধ্যে রয়েছে মদ, ড্রাগ, হিরোইন ও নেশাজাতীয় অন্যান্য মাদকদ্রব্য। আল্লাহ তাআ'লা বলেন, 'হে ঈমানদারগণ! নিশ্চয় মদ, জুয়া, মূর্তিপূজার বেদী ও ভাগ্য নির্ণায়ক শর ঘৃণ্য বস্তু, শয়তানের কাজ। সুতরাং তোমরা তা বর্জন কর যাতে তোমরা সফল হতে পারো। শয়তান তো মদ-জুয়া দ্বারা তোমাদের মধ্যে শত্রুতা ও বিদ্বেষ ঘটাতে চায় এবং তোমাদেরকে আল্লাহর স্মরণ ও সালাত থেকে বাধাগ্রস্ত করতে চায়। তবে কি তোমরা নিবৃত্ত হবে না?'[৬৭]

রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, 'নেশা সৃষ্টিকারী সকল বস্তুই মদ এবং সকল মদই হারাম।'[৬৮] তিনি আরো বলেন, 'কোন ব্যক্তি ঈমানদার অবস্থায় মদ পান করতে পারে না।'[৬৯]

অন্যত্র তিনি বলেন, 'যা বেশি পরিমাণে পান করলে নেশাসৃষ্টি হয়, তা কম পরিমাণে পান করাও হারাম।'[৭০]

২. আকল নষ্টকারী অভ্যন্তরীণ উপকরণসমূহ থেকে একে হেফাযতে রাখা। এ সবের মধ্যে রয়েছে দীন, সমাজ, রাজনীতি প্রভৃতি ব্যাপারে ভ্রান্ত ধারণা যা আকলকে বিভ্রান্ত করে এবং শরীয়তের সঠিক চিন্তাধারা থেকে আকলকে অকার্যকর করে রাখে। এজন্যই আল্লাহ্ তাআলা আল-কুরআনে কাফিরদের নিন্দা করেছেন। কারণ তারা কুরআনের আয়াতসমূহ ও আল্লাহর অন্যান্য নির্দশন সম্পর্কে চিন্তাভাবনা করার ব্যাপারে নিজেদের আকলকে কাজে লাগায়নি। ফলে তারা সত্যপথের দিশা লাভ করেনি। আল্লাহ্ বলেন, 'আপনি কি মনে করেন যে, তাদের অধিকাংশ শোনে ও বোঝে? তারা তো পশুর মতই; বরং তারা অধিক পথভ্রষ্ট।'[৭১] 'আমি তাদেরকে দিয়েছিলাম কর্ণ, চক্ষু ও অন্তর, কিন্তু তাদের কর্ণ, চক্ষু ও অন্তর তাদের কোন কাজে আসেনি। কেননা তারা আল্লাহর আয়াতসমূহকে অস্বীকার করেছিল।'[৭২]

অতএব আকলকে সত্যের পথে পৌছার জন্য কাজে লাগানো উচিত এবং আকল বিনষ্টকারী সকল বিষয় পরিহার করা উচিত।

চতুর্থ বিষয় : বংশধারার হেফাযত

বংশধারার হেফাযত মানবজাতির অতীব গুরুত্বপূর্ণ একটি অধ্যায়। এর মাধ্যমেই পৃথিবীতে মানুষ বহুকাল ধরে বেঁচে আছে এবং থাকবে। এতেই নিহিত রয়েছে জাতির শক্তি ও মান-মর্যাদা। ইসলাম বংশধারা রক্ষার প্রতি সর্বাত্মক গুরুত্ব আরোপ করেছে। আর এজন্য নিম্নলিখিত উপায় ও পন্থা অবলম্বন করেছে :

১. বংশবৃদ্ধির বৈধ পন্থা হিসাবে বিবাহের প্রতি উদ্বুদ্ধকরণ।

২. সন্তান ধারণে সক্ষম নারীকে বিবাহ করার প্রতি উৎসাহ প্রদান।

পঞ্চম বিষয় : সম্পদের হেফাযত

সম্পদ বলতে এখানে মানুষের জীবনে যে সকল বস্তু ও টাকা পয়সার প্রয়োজন সে সবকেই বুঝানো হয়েছে।[৭৩] সম্পদ ছাড়া মানুষের পার্থিব জীবন কোনমতেই চলতে পারে না। ব্যক্তি, গোষ্ঠী ও উম্মাহ (জাতি) সকলেরই প্রয়োজন সম্পদের। ব্যক্তি পর্যায়ে জীবন ধারণের জন্য প্রয়োজন অন্ন, বস্ত্র ও বাসস্থান, যা ছাড়া জীবনযাপন করা সম্ভব নয়। জনগোষ্ঠী ও উম্মাহর ক্ষেত্রেও একই কথা প্রযোজ্য। ব্যক্তির দারিদ্র্যের প্রভাব সমগ্র উম্মাহর উপর পড়ে। এভাবে বিপুল জনগোষ্ঠীর মধ্যে দারিদ্র্য দেখা দিলে উম্মাহও সংকটাপন্ন হয় এবং মান মর্যাদা হারায়। তদুপরি শত্রুর আক্রমণ হতে রক্ষা পাওয়ার জন্য প্রতিরক্ষা খাতে ব্যয়ের জন্য প্রয়োজন হয় সম্পদের। আল্লাহ্ বলেন, 'তোমরা তাদের মুকাবিলার জন্য যথাসাধ্য শক্তি ও অশ্ববাহিনী প্রস্তুত রাখবে, যদ্বারা তোমরা সন্ত্রস্ত করবে আল্লাহর শত্রুকে ও তোমাদের শত্রুকেও....।'[৭৪]

এভাবে প্রয়োজনীয় সম্পত্তির ব্যবস্থা হলেই শুধু উম্মাহ তার শত্রুদের দ্বারা আক্রান্ত হওয়ার আশংকামুক্ত হতে পারবে। কেননা আজকের বিশ্ব-ব্যবস্থায় এটা স্পষ্ট যে, দরিদ্র জাতি ও দরিদ্র রাষ্ট্র শত্রুদের নানামুখী ষড়যন্ত্রের শিকার হয় এবং এ সুযোগটিকে কাজে লাগিয়ে শত্রুরা সে জাতি ও রাষ্ট্রের উপর নিজেদের কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠার চেষ্টা যেমন চালায়, তেমনি তাদের মধ্যে নিজেদের ভ্রান্ত সংস্কৃতি, মতবাদ ও ধ্বংসাত্মক চিন্তাধারার প্রসার ঘটায়। বাংলাদেশের ক্ষেত্রে এ ব্যাপারটি জলজ্যান্ত ও বাস্তব।

সুতরাং ইসলামে সম্পত্তির হেফাযতের গুরুত্ব অত্যন্ত প্রকট। ইসলামী শারীআয় সম্পদ অর্জন ও তা সঠিকভাবে হেফাযতের জন্য নিম্নবর্ণিত উপায় ও পদ্ধতি অবলম্বন করা হয়েছে :

১. হালাল পন্থায় সম্পদ অর্জনে উদ্বুদ্ধকরণ।

২. কারো সম্পদ জবরদখল করা হারাম ঘোষণা।

৩. সম্পদ বিনষ্ট করা কিংবা অপচয় করা হারাম ঘোষণা।

৪. সম্পদের সুরক্ষার জন্য শরীআহ কর্তৃক চুরি ও ডাকাতির শাস্তি নির্ধারণ।

৫. বিনষ্ট ও ক্ষতিগ্রস্ত সম্পত্তির জামানত ও ক্ষতিপূরণ প্রদানের বিধান।

৬. সম্পদ রক্ষার জন্য যুদ্ধে লিপ্ত হওয়ার বৈধতা।

৭. ঋণ প্রদানের সময় সাক্ষী রাখা ও এর লিখিত প্রমাণাদি রাখা।

৮. অজ্ঞাতে পথে পড়ে থাকা (হারানো প্রাপ্তি) সম্পদ মালিকের কাছে পৌঁছানোর ব্যবস্থা করা।

শরীআহ এর উদ্দেশ্যের দৃষ্টিতে মানব জীবনের
প্রয়োজনসমূহ ও শোভাবর্ধনকারী
বিষয়সমূহ

মানব জীবনের প্রয়োজনসমূহ (আল-হাজিয়্যাত) : জরুরি বিষয়গুলো দিয়ে মানব জীবনের সকল চাহিদা মেটে না। জীবনকে সুষ্ঠুভাবে পরিচালিত করার জন্য তার প্রয়োজন আরো অনেক কিছু। এগুলো হলো আল-হাজিয়্যাত। ইমাম শাতিবী র. এর সংগায় বলেন, 'তা হলো সেই সকল বিষয়, মানুষের জীবনে স্বাচ্ছন্দ আনয়নের জন্য এবং কঠোরতা, সমস্যা ও অসুবিধা দূরীভূত করার জন্য যা প্রয়োজন। এ বিষয়গুলোর প্রতি যদি বিশেষ নজর দেয়া না হয় তাহলে সাধারণভাবে বান্দার উপর সমস্যা ও অসুবিধা আরোপিত হয়, তবে তা জনকল্যাণের ক্ষেত্রে স্বাভাবিক বিপর্যয় সৃষ্টির পর্যায়ে পড়ে না।'[৭৫]

আল-হাজিয়্যাত এর হেফাযতের জন্য ইসলামী শরীআহ নিম্নলিখিত উপায় অবলম্বন করেছে :

১. ইবাদাতের ক্ষেত্রে উদ্ভূত অসুবিধাসমূহ দূরীভূত করা হয়েছে, যা সচরাচর মানুষের পক্ষে সহ্য করা কষ্টকর। আল্লাহ বলেন, 'তিনি দীনের ব্যাপারে তোমাদের উপর কোন কঠোরতা আরোপ করেননি।'[৭৬]

'আল্লাহ তোমাদের উপর কোন কঠোরতা আরোপ করতে চান না....।'[৭৭]

এ দৃষ্টিকোণ থেকেই ইবাদতে রুখসাতের (সুবিধাজনক পন্থা) ব্যবস্থা করা হয়েছে। যেমন অসুস্থ ও মুসাফির ব্যক্তির জন্য রমযানে সাওম ভঙ্গের অনমুতি রয়েছে। এছাড়াও মুসাফির ব্যক্তির জন্য সফরে কসর সালাত আদায়ের বিধান রাখা হয়েছে। শারীআয় এ রকম আরো অনেক রুখসাত রয়েছে।

২. মানুষ যাতে স্বচছন্দের সাথে জীবন যাপন করতে পারে সেজন্য অন্ন-বস্ত্রের সংস্থান হিসাবে নানা প্রকার অসংখ্য পবিত্র বস্তুও ব্যবহার তাদের জন্য বৈধ করে দেয়া হয়েছে।

৩. মুআমালাতের ক্ষেত্রে ব্যবসা-বাণিজ্য ইজারাহ, বাই সালাম, মুদারাবা প্রভৃতি ব্যবসায়ী পদ্ধতি জায়েয করা হয়েছে।

জীবনের শোভাবর্ধনকারী বিষয়সমূহ (আত-তাহসিনিয়্যাত)

আত-তাহসিনিয়্যাত হচ্ছে যা প্রয়োজনীয়তার পর্যায়ে পড়ে না, বরং তা শোভাবর্ধনকারী সৌন্দর্যের পর্যায়ে পড়ে। এর সংজ্ঞায় ইমাম শাতিবী রহ. বলেন, 'যা উত্তম বলে বিবেচিত তা গ্রহণ করা এবং সুস্থ বিবেক ঘৃণা করে এমন সব নিকৃষ্ট জিনিস পরিহার করা.... ।'[৭৮]

আত-তাহসিনিয়্যাত এর উদাহরণ :

১. সুস্বাদু খাবার গ্রহণ ও উত্তম পোশাক পরিধান।

২. শরীর ও পোশাক হতে নাপাক, ময়লা ইত্যাদি দূর করা।

৩. শরীআহ এর সুন্নাত ও মুস্তাহাব পর্যায়ের কাজসমূহ।

৪. সকল প্রকার শিষ্টাচার।

৫. বৈধ বিলাসী সামগ্রীর ব্যবহার।

শরীআহ এর উদ্দেশ্যের সাথে সংশ্লিষ্ট কিছু গুরুত্বপূর্ণ আইনগত রীতি-নীতি

শরীআহ এর উদ্দেশ্যের আলোকে আলেমগণ সংক্ষিপ্ত ও সুন্দর বেশ কিছু আইনী রীতি-নীতি পেশ করেছেন, যার উপর ভিত্তি করে ইসলামী আইন বিষয়ক অনেক বিধান সহজেই উদ্ভাবন করা যায়। নিচে কয়েকটি উদাহরণ পেশ করা হলো।

১. শরীআহ এর উদ্দেশ্য ও লক্ষ জানা যাবে কুরআন, সুন্নাহ ও ইজমা' দ্বারা।[৭৯]

২. যেসব উপায়-উপকরণ পাঁচটি জরুরি বিষয়ের হেফাযতের জন্য জরুরী, তা কল্যাণ (মাসলাহা) বলে গণ্য হবে এবং যা দ্বারা উক্ত পাঁচটি বিষয়ের ক্ষতি হবে তা অকল্যাণ (মাফসাদা) বলে গণ্য হবে।[৮০]

৩. যখন এমন দু'টি ক্ষতিকর বিষয় উদ্ভূত হবে যার একটিকে অবশ্যই বরণ করতে হবে তখন অপেক্ষাকৃত কম ক্ষতিকর বিষয়টি গ্রহণ করে অধিক ক্ষতিকর বিষয়টি বর্জন করতে হবে।[৮১]

৪. শরীআহ প্রণেতার উদ্দেশ্য ও ইচ্ছা হচ্ছে নির্দেশ পালনের ক্ষেত্রে সকল কঠোরতা ও অসুবিধা বিলোপ করা।[৮২]

৫. নির্দেশ পালনের ক্ষেত্রে স্বাভাবিক কষ্ট স্বীকার ও অসুবিধা বজায় থাকবে।[৮৩]
৬. কোন কাজের নির্দেশ প্রদানের অর্থই হচ্ছে শরীআহ প্রণেতা চান সে কাজ বাস্তবায়িত হোক এবং কোন কাজ নিষিদ্ধ করার অর্থই হলো শরীআহ প্রণেতা চান সে কাজ পরিত্যক্ত হোক।[৮৪]
৭. শরীআহ প্রণেতার কোন কাজের প্রশংসা দ্বারা বোঝা যায় যে, তিনি চান সে কাজ বাস্তবায়িত হোক।[৮৫]
৮. সামষ্টিক কল্যাণ ব্যক্তি কল্যাণের উপর প্রাধান্য পাবে।[৮৬]
৯. মৌলিক কল্যাণ গৌণ ও আনুষঙ্গিক কল্যাণের উপর প্রাধান্য পাবে।[৮৭]
১০. কল্যাণ অর্জনের আগে অকল্যাণ দূর করা শরীআহ প্রণেতার দৃষ্টিতে অগ্রগণ্য।[৮৮]

শরীআহ্-এর উদ্দেশ্য ও ইজতিহাদ

ইমাম শাতিবীর মতে মুজতাহিদের জন্য শরীআহ-এর উদ্দেশ্য সম্পর্কে জ্ঞান থাকা শর্ত। কেননা এ বিষয়ে পর্যাপ্ত জ্ঞানের অভাবে ইজতিহাদ ভুল-ভ্রান্তিতে পর্যবসিত হওয়ার আশংকাই বেশি।[৮৯] আল্লামা তাহির ইবন আশূর অত্যন্ত জোর দিয়ে বলেছেন যে, ইজতিহাদের সকল ক্ষেত্রে উদ্দেশ্য সম্পর্কে যথার্থ জ্ঞান থাকা অপরিহার্য।[৯০]

যে কোন বিষয়ে মুজতাহিদ হুকুম দেয়ার সময় অবশ্যই লক্ষ রাখবেন যে, এতে শরীআহ্ এর উদ্দেশ্য কি, যাতে একই রকম অন্যান্য বিষয়ে অনুরূপ হুকুম প্রদান করা যায়। শরীআহ্ এর একটি অন্যতম দলীল কিয়াস ভিত্তিক আইনি সমাধান বের করার ক্ষেত্রে শরীআ-এর উদ্দেশ্য জ্ঞানের প্রয়োজনীয়তা রয়েছে অনেক বেশি। তাছাড়া মাসালিহ মুরসালা শরীআহ্ সমর্থিত কিনা তা পুরোপু-রি নির্ভর করে ইলমুল মাকাসিদ এর উপর।

শরীয়তের লক্ষ-উদ্দেশ্য-এর প্রাসঙ্গিকতা ও গুরুত্ব

বান্দার কল্যাণ সাধন যে আল্লাহর উদ্দেশ্য শরীআহ-এর উদ্দেশ্য বলতে মূলত তাকেই বুঝায়। আল্লাহ আমাদের স্রষ্টা। বান্দার পার্থিব ও পারলৌকিক প্রয়োজন পূরণই ইসলামী শরীআহ্ এর বিধানের উদ্দেশ্য।

যে লক্ষে আল্লাহ্ মানব জাতির জন্য কালজয়ী ইসলামী আদর্শ প্রদান করেছেন, সে লক্ষ অর্জন না করে শুধু কতকগুলো প্রথা ও (Rituals) পালন করা তাঁর কাছে কোন অর্থ বহন করে না। শরীআহ-এর উদ্দেশ্য সম্পর্কে জ্ঞান না থাকার কারণে আজ মুসলমানদের প্রাত্যহিক কর্মে দেখা দিয়েছেন বৈসাদৃশ্য। যে মুসলমান প্রতিদিন পাঁচ ওয়াক্ত সালাত আদায় করে আল্লাহর আনুগত্যের ঘোষণা দেয়, সে আবার তার অর্থনৈতিক লেনদেন কিংবা রাজনৈতিক কর্মকাণ্ডে সেই আল্লাহরই নাফরমানি করতে দ্বিধা করে না। ইসলামী শরীআহ্ এর মূল উদ্দেশ্য হচ্ছে মানবতার সার্বিক কল্যাণ সাধন এবং যাবতীয় অকল্যাণ থেকে সমগ্র মানবতাকে রক্ষা করা। গভীরভাবে শরীয়তের উদ্দেশ্য উপলব্ধি না করার কারণেই আজ মুসলমানের অনেকে ইসলামকে আচার-অনুষ্ঠান সর্বস্ব ধর্ম মনে করেছেন। ফলে তাদের ঈমানহারা হওয়ার উপক্রম হয়েছে। অন্যদিকে যেহেতু এ বিষয়টি

আমাদের দেশের মাদরাসা ও ইসলামী শিক্ষার পাঠ্যসূচির অন্তর্ভুক্ত হয়নি, ফলে এ সম্পর্কিত ব্যাপক অজ্ঞতা বিরাজ করছে আলেম, ইসলামী চিন্তাবিদ ও গবেষকদের মধ্যেও। মাসআলার বিভিন্নতা ইসলামী শরীআহ এর মধ্যে তেমন গুরুত্বপূর্ণ নয়, বরং সর্বাধিক গুরুত্বপূর্ণ হচ্ছে শরীআহ এর লক্ষ অর্জন আমরা পূর্ববর্তী ইমাম ও স্কলারদেরকে দেখি তারা পরস্পর অনেক মতানৈক্য করেছেন, কিন্তু উদ্দেশ্যের ক্ষেত্রে তাদের মধ্যে কোন বিভেদ ছিল না। তাদের মধ্যে গবেষণা ছিল একটা অব্যাহত প্রক্রিয়া এবং নিজেদের কোন ভুল প্রমাণিত হলেই তারা সঠিক সিদ্ধান্তে ফিরে যেতেন।

যারা আজ দীনের দায়ী হিসেবে কাজ করনে, ইসলামী অন্দোলনের সক্রিয় ভূমিকা পালন করছেন, তাদের জন্য এ বিষয়ে জ্ঞান অর্জনের গুরুত্ব অনেক বেশি। যাতে দীনের কাজ করতে গিয়ে তারা দীনের মূল স্রোত থেকে দূরে সরে না যান, এবং উদ্ভূত পরিস্থিতিতে শরীআহ এর কোন উদ্দেশ্যের পরিপন্থি সিদ্ধান্ত না নিয়ে ফেলেন।

বর্তমান প্রেক্ষাপটের আলোকে তাই আমি নিম্নবর্ণিত সুপারিশমালা পেশ করছি।

১. একাডেমিক প্রতিষ্ঠানসমূহে এ বিষয়টি অন্তর্ভুক্ত করা। বিশেষ করে বিশ্ববিদ্যালয়সমূহের ইসলামী শিক্ষাবিভাগ ও মাদরাসা শিক্ষার উচ্চস্তরে এ বিষয়টিকে পাঠ্যসূচির অন্তর্ভুক্ত করা উচিত।

২. ইসলামী চিন্তাবিদ, গবেষক, মুফতি, আলেম ও আইনজীবীদের এ সম্পর্কে প্রয়োজনীয় জ্ঞান অর্জন করা উচিত।

৩. ইসলামী আন্দোলনের নেতা-কর্মীসহ সকল দায়ী ইলাল্লাহ এবং ওয়ায়েজ ও খতীবগণ যদি এ বিষয়ে জ্ঞানার্জন করেন, তাহলে মাকাসিদ আশ-শরীআহ'র আলোকে তাদের বক্তব্য ও আমল হবে একমুখী এবং এতে করে তাদের মধ্যে ঐক্য সৃষ্টির পথও হবে প্রশস্ত।

৪. সকল মুসলিম অথরিটি যেমন বিভিন্ন সামাজিক ও রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠান সরকারের নীতি নির্ধারণী পর্যায়ে যারা রয়েছেন তারা যদি মাকাসিদের আলোকে তাদের কর্মপরিকল্পনা সাজিয়ে নেন, তাহলে শরীআহ প্রণেতার ইচ্ছার আলোকেই সকল কাজকে আঞ্জাম দেয়া সম্ভব হবে।

৫. ব্যাংক সেক্টরে যারা ইসলামী ব্যাংকিং এর পুরোধায় রয়েছেন, তারা যদি তাদের উৎপাদন কর্মসূচি, ঋণদান কর্মসূচি ও সাহায্য কর্মসূচি মাকাসিদের আলোকে বাস্তবায়ন করেন, তাহলে ব্যক্তি, সমাজ, দেশ ও জাতি উপকৃত হবে।

উপসংহার : মাকাসিদ আশ-শরীআহ হচ্ছে পবিত্র কুরআন ও সুন্নাহর গবেষণার একটি বুদ্ধিবৃত্তিক নির্যাস। ইসলামী গবেষণা ও জ্ঞান অর্জনের পথে একটি সুন্দর গাইড লাইন।

তথ্যপঞ্জি

১. আস-সিহাহ, ইসমাঈল ইবন হাম্মাদ আল-জাওহারী, ৩/১২৩৬, লিসানুল আরাব, ইবনু মানযূর, ৮/১৭৪।

২. লিসানুল আরাব, ৮/১৭৪।

৩. মাজমূ' আল-ফাতাওয়া, ইবনু তাইমিয়াহ, ১৯/৩০৬।
৪. প্রাগুক্ত, ১৯/৩০৯।
৫. সূরা আল-কাসাস : ৬৮।
৬. সূরা আল-মুলক : ১৪।
৭. সূরা আল-আনফাল : ৭১।
৮. সূরা আল-আম্বিয়া : ১০৭।
৯. সূরা আল-আ'রাফ : ১৫৮।
১০. সূরা সাবা : ২৮।
১১. সূরা আন-নাহল : ৮৯।
১২. সূরা আল-হিজর : ৯।
১৩. সূরা আল-বাকারাহ : ১৮৫।
১৪. সূরা আল-হাজ্জ : ৭৮।
১৫. সূরা আল-বাকারাহ : ২৮৬।
১৬. সূরা আন-নূর : ৩৭।
১৭. সূরা আল-জুমুআহ : ১০।
১৮. মুসনাদ ইমাম আহমাদ, হাদীস নং ২৩৭১০ ও ২৪৭৭১।
১৯. মাআলিম ফিত-তরীক, সাইয়েদ কুতুব, পৃ. ১১১।
২০. মুওয়াত্তা ইমাম মালেক ও মুসনাদ আহমাদ।
২১. আস-সিহাহ, ২/৫২৪, লিসানুল আরাব, ৩/৩৫৩, আল-মু'জাম আল-ওয়াসীত, ২/৭৩৭।
২২. মাকাসিদুশ-শরীআহ আল-ইসলামিয়াহ, ড. মুহাম্মাদ সাদ আল-ইয়ূবী, পৃ. ২৩-২৪।
২৩. মাকাসিদুশ শরীআহ, মুহাম্মাদ তাহির ইবন আশূরও, পৃ. ৫১।
২৪. ইমাম শাতিবীর মাকাসিদ তত্ত্ব, ড. আহমাদ আল-রাইসূন, পৃ. ৭।
২৫. মাকাসিদুশ-শরীআহ আল-ইসলামিয়াহ, ড. মুহাম্মাদ সা'দ আল-ইয়ূবী, পৃ. ৩৭।
২৬. আল-মাকাসিদ আল-শারইয়াহ, ড. নূরুদ্দীন ইবন মুখতার আল-খাদিমী, পৃ. ৩০-৩৩।
২৭. সূরা হা-মীম আস-সাজদাহ : ৪২।
২৮. সূরা আয্-যুমার : ১, আল-মুমিন : ২, আল-জাসিয়া : ২, আল-আহকাফ : ২।
২৯. সূরা আল-আ'রাফ : ১৫৬।
৩০. সূরা আল-মুমিনূন : ১০৯।
৩১. শিফাউল 'আলীল, ইমাম ইবনুল কাইয়েম, পৃ. ৪২৬।
৩২. সূরা আল-বাকারাহ : ১৪৩।
৩৩. সূরা আন-নিসা : ১০৫।
৩৪. সূরা আল-হাজ্জ : ৭৮।

৩৫. সূরা তহা : ১৪।
৩৬. সূরা আল-বাকারাহ : ১৮৩।
৩৭. মাকাসিদুশ-শরীআহ আল-ইসলামিয়াহ, ড. মুহাম্মাদ সা'দ আল-ইয়ূবী, পৃ. ১২৩।
৩৮. সূরা আল-বাকারাহ : ২১।
৩৯. সূরা আন-নাহল : ৮৯।
৪০. সূরা আল-হাশর : ৭।
৪১. সহীহ মুসলিম, ৩/১৫৬১।
৪২. সূরা আল-বাকারাহ : ১৮৫।
৪৩. সূরা আন-নিসা : ২৬-২৭।
৪৪. সূরা আল-মাইদাহ : ৬।
৪৫. সূরা বনী ইসরাঈল : ২৩।
৪৬. সূরা মুমতাহিনা : ১০।
৪৭. সূরা আল-বাকারাহ : ১৮৩।
৪৮. সূরা আল-বাকারাহ : ১৮৪।
৪৯. সূরা আন-নিসা : ১৯।
৫০. মাকাসিদুশ-শরীআহ আল-ইসলামিয়াহ, ড. মুহাম্মাদ সা'দ আল-ইয়ূবী, পৃ. ১৭৯।
৫১. আল-মুয়াফাকাত, ২/৮।
৫২. শারহ আল-মুহাল্লী আ'লা জামঈল জাওয়ামি', জালালউদ্দিন মুহাম্মাদ ইবন আহমাদ আল-মুহাল্লী, ২/২৮।
৫৩. আল-মুয়াফাকাত, ১/৩৮, মাকাসিদুশ-শরীআহ আল-ইসলামিয়াহ, ড. মুহাম্মাদ সা'দ আল-ইয়ূবী, পৃ. ১৮৩।
৫৪. সূরা আলে ইমরান : ১৯।
৫৫. সূরা আলে ইমরান : ৮৫।
৫৬. সূরা আল-হিজর : ৯।
৫৭. ইসলাম ও জীবনের অপরিহার্য বিষয়সমূহ, পৃ. ৩১।
৫৮. ইসলাম ও জীবনের অপরিহার্য বিষয়সমূহ, পৃ. ৩১; মাকাসিদুশ শরীআহ আল-ইসলামিয়াহ, পৃ. ১৯৭-১৯৮।
৫৯. সূরা আন-নিসা : ৬৫।
৬০. সূরা আল-মাইদাহ : ৪৪।
৬১. সূরা আলে ইমরান : ১০৪।
৬২. সূরা আলে ইমরান : ১১০।
৬৩. সূরা আল-কাসাস : ৮৭।

৬৪. সূরা আন-নাহল : ১২৫।

৬৫. সূরা ইউসুফ : ১০৮।

৬৬. সূরা তওবাহ : ১১১।

৬৭. সূরা আল-মাইদাহ : ৯০-৯১।

৬৮. সহীহ মুসলিম, ৩/১৫৮৭, হাদীস নং ৭৩।

৬৯. সহীহ বুখারী, ৫/১১৯, হাদীস নং ২৪৭৫, সহীহ মুসলিম, ১/৭৬, হাদীস নং ১০০।

৭০. মুসনাদ ইমাম আহমাদ, ২/৯১, ১৬৭, ১৭৯, সুনান আবি দাউদ, ৩/৩২৭, হাদীস নং ৩৬৮১, সুনান তিরমিযী, ৪/২৯২, হাদীস নং ১৮৬৫, সুনান ইবনে মাজাহ, ২/১১২৪, হাদীস নং ৩৩৯২-৩৩৯৪।

৭১. সূর আল-ফুরকান : ৪৪।

৭২. সূরা আল-আহকাফ : ২৬।

৭৩. মাকাসিদুশ শরীআহ আল-ইসলামিয়াহ, পৃ. ২৮৫।

৭৪. সূরা আত-তাওবাহ : ৬০।

৭৫. আল-মুয়াফিকাত ২/১১।

৭৬. সূরা আল-হাজ্জ : ৭৮।

৭৭. সূরা আল-মাইদাহ : ৬।

৭৮. আল-মুয়াফিকাত ২/১১।

৭৯. আল-মুস্তাসফা, ইমাম আল-গাযালী, পৃ. ২৫৮।

৮০. প্রাগুক্ত, পৃ. ২৫১।

৮১. প্রাগুক্ত, পৃ. ২৫৮।

৮২. আল-কাওয়ায়েদ, মাক্কারি, ২/৪৩২।

৮৩. আল-মুয়াফাকাত, ইমাম শাতিবী, ১/১৮৩।

৮৪. প্রাগুক্ত, ২/৩৯৩, ৩/১২২।

৮৫. প্রাগুক্ত, ২/২৪।

৮৬. কাওয়ায়েদুল আহকাম, ইযযুদ্দীন ইবন আবদুস সালাম, ১/৭১, আল-মুওয়াফাকাত, ২/৩৫০।

৮৭. আলমুয়াফাকাত, ২/১৪।

৮৮. আল-কাওয়ায়েদ, মাক্কারি, ২/৪৪৩

৮৯. আল-মুয়াফাকাত, ৪/১৭৯।

৯০. মাকাসিদ আশ-শরীআহ আল-ইসলামিয়াহ, পৃ. ১৫.১৬।

ইসলামী আইন ও বিচার
জানুয়ারী-মার্চ ২০০৭
বর্ষ ৩, সংখ্যা ৯, পৃষ্ঠা : ৩২-৪১

জমি ক্রয়-বিক্রয়ে শফী তথা অংশীদার ও প্রতিবেশীর অধিকার এবং প্রচলিত প্রি-এমশন আইন

জাফর আহমাদ

ভূমিকা

আরবী 'জার' শব্দের অর্থ প্রতিবেশী। বাঁশঝাড়ের 'ঝাড়' শব্দটির সাথে আরবী 'জার' শব্দের কী গভীর মিল। বাংলা অভিধানে 'ঝাড়' শব্দের অর্থ করা হয়েছে ঘন বৃক্ষাবলী। অর্থাৎ অতি নিকটে পাশাপাশি অবস্থান করার কারণে একে ঝাড় নামকরণ করা হয়েছে। বাঁশঝাড়ের বাঁশগুলো পাশাপাশি প্রতিবেশীর মতো অবস্থান করায় একে 'বাঁশ+ঝাড়' বলা হয়। বাঁশগুলো মিলেমিশে পাশাপাশি একসাথে বসবাস করে বিধায় বিভিন্ন সময়ে প্রবল ঝড়-তুফানকেও মোকাবেলা করে টিকে থাকতে পারে। অন্যথায় শুধুমাত্র একটি বাঁশ একাকি এক জায়গায় বা ফাঁকা জায়গায় কখনো সোজা হয়ে দাঁড়িয়ে থাকতে পারতো না। মানুষও প্রতিবেশীদের সহযোগিতা ছাড়া সমাজে বেশিদিন টিকে থাকতে পারে না। তাই নিজেদের অস্তিত্বের প্রয়োজনে সমাজবদ্ধ হয়ে বসবাস করতে হয়। এজন্য কুরআন ও হাদীসে প্রতিবেশীদের সাথে সম্প্রীতি, সহ-অবস্থান, ভ্রাতৃত্ববোধ, সমাজবদ্ধতা বা দলীয় জীবন ও ঐক্যের প্রতি অত্যধিক গুরুত্বারোপ করা হয়েছে। এ গুরুত্বকে সামনে রেখে ইসলাম পারস্পরিক সম্পর্ক-সম্বন্ধ ও অধিকারের সীমা নির্ধারণের জন্য বিধি-বিধান নির্ণয় করেছে। প্রত্যেকের স্বেচ্ছাচারিতাকে সীমিত ও নিয়ন্ত্রিত করেছে। কেননা মানুষ স্বভাবতই স্বার্থপর ও আত্মপূজারী। পারস্পরিক জুলুম-নির্যাতন-নিষ্পেষণ, অধিকার হরণ এবং সামাজিক বিপর্যয় রোধ করার জন্য ইসলাম তার অন্যান্য বিধি-বিধানের ন্যায় জমি বা স্থাবর সম্পত্তি ক্রয়-বিক্রয়ে একটি নীতি নির্ধারণ করেছে। সেটি হলো জমি বিক্রি করার সময় অবশ্যই সর্বপ্রথম অংশীদার ও প্রতিবেশীর সঙ্গে যোগাযোগ করতে হবে। একে ইসলামের পরিভাষায় শুফআ এবং ইংরেজীতে **Preemption** বলা হয়।

শুফআর সংগা

শুফআ শব্দটির উৎপত্তিস্থল সম্পর্কে বিভিন্ন অভিমত রয়েছে। হেদায়া গ্রন্থকার বুরহানুদ্দীন মুরগীনানী র. বলেন, 'শুফআতুন' 'শাফউন' শব্দ হতে নির্গত হয়েছে। এর অর্থ যুক্ত করা, মিলিত করা। বেজোড়ের বিপরীতকেও শাফউন বলে। আল্লাহ তাআলা বলেন, 'ওয়াশ শাফউ ওয়াল

লেখক : প্রিন্সিপাল অফিসার, ইসলামী ব্যাংক বাংলাদেশ লিঃ

বিতরু'। এখানে শাফউ অর্থ জোড়। আর 'শাফাআতে রাসূল' এর উৎপত্তি এখান থেকেই। কেননা শাফাআত এর বদৌলতে পাপীগণ সফলকাম ও সৎলোকদের সাথে একত্রিত হবেন।[১] যেহেতু শফী শুফআর দ্বারা প্রাপ্ত বস্তুকে তার মালিকানার সংগে যুক্ত করে থাকে, সেহেতু এর নামকরণ করা হয়েছে শুফআ। আর এ শুফআর হক যে লাভ করে তাকে বলে শফী।

শুফআর পারিভাষিক অর্থ

ক. আল্লামা কিরমানী র. বলেন, পরিভাষায় শুফআ বলে, 'এমন কিছুর বিনিময়ে আইনানুগভাবে জমিনের মালিক হওয়া যা পুরাতন শরীক নতুন শরীককে প্রদান করে থাকে।

খ. আল্লামা আইনীর র. ভাষায়, 'অংশীদার বা প্রতিবেশী হওয়ার কারণে ক্রেতার পরিশোধিত মূল্যের বিনিময়ে জমিনের মালিক হওয়া।'

গ. কানযুদ-দাকায়েক প্রণেতা হাফেজ নাসাফী র. বলেন, 'ক্রেতার নিকট থেকে আইনানুগভাবে ঐ মানের বিনিময়ে জমিনের মলিকানা লাভ করা যতটুকুর বিনিময়ে ক্রেতা উক্ত জমি খরিদ করেছে।'

ঘ. আল্লামা ইতকানী র. বলেন, 'মালিকানা লাভ করাকেই শুফআ বলে।' (নাতায়েজুল আফকার)

ঙ. কোন ব্যক্তির ক্রয়কৃত স্থাবর সম্পত্তি নির্দিষ্ট শর্তে অগ্রাধিকার ভিত্তিতে অন্য কোন ব্যক্তির ক্রয় করিয়া মালিক হইবার অধিকারকে 'শুফআ' বলে।[২]

উপরোল্লেখিত সংগাগুলোর প্রেক্ষিতে শুফআ বলতে 'এমন কোন স্থাবর সম্পত্তি যাতে কয়েকজন শরীক রয়েছে অথবা যাতায়াতের রাস্তায়, পানি সংগ্রহ সেচকরণ ও পানি সেচের নালায় হক রয়েছে অথবা এমন প্রতিবেশী যার জমির সাথে অন্যের জমি সংযুক্ত রয়েছে, তা বিক্রি করার সময় প্রতিবেশীদের অধিকারকে বুঝায়। অর্থাৎ এ ধরনের জমি বিক্রি করার সময় অবশ্যই প্রতিবেশীর অধিকারের স্বীকৃতিস্বরূপ তাকেই প্রথম প্রস্তাব পেশ করতে হবে। যদি তা না করা হয় তবে বিক্রিত জমির মূল্য পরিশোধ সাপেক্ষে প্রতিবেশীর মালিক হওয়াকে শুফআ বলে। আর যে আইনের আওতায় এ ধরনের মালিকানা সাব্যস্ত হয় সেটি 'শুফআ' আইন নামে পরিচিত। ইংরেজী পরিভাষায় যাকে Preemption বলে।

শুফআ আইনের গুরুত্ব

শুফআ একটি গুরুত্বপূর্ণ আইন। ইসলামের এ গুরুত্বপূর্ণ আইনটি আমাদের সমাজ ব্যবস্থায় কার্যকর না থাকায় আজকাল জমি ক্রয়-বিক্রয়ে অনেক জুলুম-নির্যাতন পরিলক্ষিত হয়। এজন্য সামাজিক ফিতনা-ফাসাদ থেকে শুরু করে অনেক ক্ষেত্রে প্রাণহানিও ঘটতে দেখা যায়। জমির মালিক এবং প্রতিবেশী উভয়ের পক্ষ থেকেই এ প্রবণতা লক্ষ করা যায়। এক দিকে জমির মালিক প্রতিবেশীকে বিপদে ফেলার নিমিত্ত তাকে না জানিয়ে অন্যত্র জমি বিক্রি করে দেয়। ফলে নতুন প্রতিবেশী পুরাতন প্রতিবেশীর বিভিন্ন অধিকার ও সুযোগ-সুবিধায় প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করে। আর তখনই সৃষ্টি হয় বাক-বিতণ্ডা থেকে শুরু করে পেশী শক্তি প্রদর্শন। পর্যায়ক্রমে এটি সমাজকেও

আক্রান্ত করে। ব্যক্তি সীমানা পেরিয়ে সমাজের বিবেকবান এবং বিবেকহীন লোকগুলোকে উভয় পক্ষেই এনে দাঁড় করায়। সামাজিক বিশৃংখলা অনিবার্য হয়ে পড়ে। আবার এমনটিও লক্ষ করা যায় যে, কোন কোন প্রতিবেশী জমির কম মূল্য হাঁকিয়ে অন্য প্রতিবেশীর জমি বিক্রিতে প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করে। বাইরের কোন খরিদ্দার এলে তাকে হুমকি ধমকি দিয়ে তাড়িয়ে দেয়। লক্ষ-উদ্দেশ্য হলো প্রতিবেশী যেন স্বল্প মূল্যে তার কাছে বিক্রি করতে বাধ্য হয়। এবং শেষাবধি বিক্রেতাকে সেটিই করতে হয়। অত্যন্ত কমদামে বিক্রি করে তাকে চলে যেতে হয়। ফলে সে আর্থিকভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হয়। আবার এমনটিও লক্ষ করা যায় যে কোনক্রমে প্রতিবেশী অন্যত্র বিক্রি করে দিলেও নতুন প্রতিবেশীটি পুরাতন প্রতিবেশীর নির্যাতনের শিকার হয়। বিভিন্ন সুযোগ-সুবিধা থেকে তাকে বঞ্চিত করা হয়। শুফাআ আইনের অনুপস্থিতিতে এ সমস্ত চিত্র আমাদের সমাজ ব্যবস্থায় নিত্য-নৈমিত্তিক ব্যাপার হয়ে দাঁড়িয়েছে। এ পরিস্থিতি থেকে উদ্ধার পেতে হলে স্থায়ী প্রকৃতির কোন কিছু বিক্রি করার সময় অবশ্যই সর্বপ্রথম শফী তথা অংশীদার ও প্রতিবেশীকে আনুষ্ঠানিকভাবে জানাতে হবে। তাছাড়া দূরবর্তী কোন ক্রেতা জমি ক্রয় করার সময় শুফআর বিষয়টি বিবেচনায় আনতে হবে। তাতে অনেক অনাকাঙ্ক্ষিত বিষয় এড়ানো সম্ভব হবে। এ আলোচনার প্রেক্ষিতে বুঝা যায় শুফআ একটি গুরুত্বপূর্ণ আইন।

শুফআ আইনের লক্ষ উদ্দেশ্য

সার্বিকভাবে ইসলামী আইনের লক্ষ উদ্দেশ্য হলো বিশ্বমানবতাকে যথেচ্ছাচার, ভুল-ভ্রান্তি ও কামনা-লালসার শিকার হওয়া থেকে মুক্ত করে সত্য, সুবিচার ও ন্যায়পরায়ণতার দিকে নিয়ে আসা, যেন পৃথিবীতে আল্লাহর খিলাফত বা প্রতিনিধিত্বের দায়িত্বপূর্ণ কাজটি সঠিক ও সুষ্ঠু নিয়মে কার্যকর ও বাস্তবায়িত হতে পারে।[৩] মোট কথা ব্যক্তি ও সমাজের কল্যাণ সাধনে শুফআ হচ্ছে ইসলামের একটি আইন। ইসলামের এ আইনটিরও লক্ষ-উদ্দেশ্য হচ্ছে মানবীয় সমাজ-পরিস্থিতির সংশোধন ও উন্নয়নের ধারাবাহিকতা বাধাগ্রস্ত করতে পারে যে সকল দুরাচার, তার অনুপ্রবেশকে প্রতিহত করা। মানুষ স্বভাবতই যে সামাজিক জীবন যাপনে বাধ্য, সেই সামাজিক জীবনকে কল্যাণময় আদর্শ ভাবধারায় সিক্ত করাই ইসলামের শুফআ আইনের লক্ষ। সর্বোপরি ইসলামী আইনের লক্ষ উদ্দেশ্য হলো মানুষের সামগ্রিক কল্যাণ সাধন করা এবং তা অনুসরণের মাধ্যমে আল্লাহর সন্তুষ্টি হাসিল করা। তদ্রূপ ইসলামী আইনের একটি শাখা হিসাবে শুফআ এর লক্ষ-উদ্দেশ্যও তাই। বিশেষভাবে বলতে গেলে এর লক্ষ-হলো :

এক. মানুষ যাতে কোন নবাগত প্রতিবেশী হওয়ার দরুণ কষ্ট না পায়, এজন্য অযাচিত প্রতিবেশীকে তার প্রতিবেশের মধ্যে প্রবেশে বাধা দেয়া।

দুই. সম্পত্তিকে বিভক্ত হওয়ার ক্ষতি থেকে নিরাপদ রাখা।[৪] প্রত্যেক ব্যক্তি এমন একজন প্রতিবেশীর আকাঙ্ক্ষা করেন যার আচরণ ও অভ্যাস সুন্দর। সামাজিক নিরাপত্তা ও শান্তি লাভের সদুদ্দেশ্যের জন্য ব্যক্তিকে এ অধিকার দান করা হয়েছে।

শুফআর শ্রেণী বিভাগ

শফীর তিনটি স্তর বা শ্রেণী রয়েছে :

ক. খালিত ফি নাফসিল মবীয় : অর্থাৎ মালিকানা স্বত্বে অংশীদারিত্ব। বিক্রিত স্থানটির মালিকানায় কয়েকজন শরীক রয়েছে। তারা উত্তরাধিকারী সূত্রে যৌথভাবে এর মালিকানা লাভ করুক বা যৌথভাবে ক্রয়ের দ্বারা মালিক হোক বা অন্য কেউ তাদেরকে হিবা (দান) করুক।

খ. খালিত ফি হাক্কিল মবীয় : অর্থাৎ অধিকার ও সুবিধাদিতে অংশীদার হওয়া। বিক্রিত স্থানের মালিকানার মধ্যে অংশীদারী নয়। তবে এর হুকুক এর মধ্যে অংশীদারী। যেমন বিক্রিত জমির যাতায়াতের রাস্তার মধ্যে অংশীদার, পানি সেচ করতে হলে পরস্পরের জমির প্রয়োজন হয় বা যে নালা হতে পানি সেচ করতে হয় তাতে উভয়ের অধিকার রয়েছে।

গ. ঝাড় : অর্থাৎ প্রতিবেশী হওয়া। যার জমি বিক্রিত জমির সাথে সংযুক্ত রয়েছে। উভয় স্থানের দেয়াল মিলিত রয়েছে। উভয়ের রাস্তা এক বা অভিন্ন।

শফীর অধিকার সম্পর্কে দলিল

প্রথম প্রকার শুফআর দলিল : হযরত যাবের ইবনে আব্দুল্লাহ রা. থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, যে ব্যক্তির কোন ঘরে কিংবা বাগানে অন্য কেউ অংশীদার রয়েছে, সে তার অনুমতি না নেয়া পর্যন্ত তা বিক্রি করতে পারে না, যদি সে পছন্দ করে তাহলে রাখবে আর যদি অপছন্দ হয় তবে ছেড়ে দেবে।[৫]

হযরত যাবের রা. হতে আরো বর্ণিত আছে। তিনি বলেন, প্রতিটি অবিভক্ত অংশীদারী সম্পত্তিতে রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম শুফআ নির্ধারণ করেছেন। চাই তা ঘর হোক কিংবা বাগান। কারো পক্ষে হালাল নয় তার অংশীদারকে অবগত না করে তা বিক্রি করা। সে ইচ্ছা করলে তা রেখে দেবে, নয়তো ছেড়ে দেবে। আর যদি তাকে না জানিয়ে বিক্রি করে তাহলে সে সকলের চেয়ে বেশি হকদার।'[৬]

হযরত যাবের রা. হতে আরো বর্ণিত আছে। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, প্রতিটি অংশীদারী জিনিসে অর্থাৎ ঘর-বাড়ি কিংবা বাগানে শুফআর অধিকার রয়েছে। তার অংশীদারের নিকট (বিক্রির প্রস্তাব) উপস্থাপন না করা পর্যন্ত তা বিক্রি করা সঠিক নয়। হয় সে তা ক্রয় করবে অথবা পরিত্যাগ করবে। সে যদি (তার অংশীদারের কাছে তা বিক্রি করতে) অসম্মতি জানায় তখনো তার অংশীদার (শুফআর) অধিক হকদার। অতএব তার অনুমতি না নিয়ে তা বিক্রি করা যাবে না।'[৭]

উল্লেখিত হাদীসগুলো প্রথম শ্রেণীর শুফআর দলিল। এ হাদীসগুলোর মাধ্যমে এ কথা সুস্পষ্ট হয়েছে যে, এমন যৌথ মালিকানাভুক্ত সম্পদে রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম শুফআর অধিকার সাব্যস্ত করেছেন যা বণ্টন করা হয়নি। সুতরাং কোন অংশীদার অপর অংশীদারকে অবহিত করা ছাড়া সম্পদ বিক্রি করা বৈধ হবে না। যদি এমনটি করে তবে সেই সর্বাধিক হকদার

(শুফআর) বিবেচিত হবে। এ ব্যাপারে কোন আলেম ও ফকীহ্ দ্বিমত পোষণ করেননি, বরং সকলেই একমত পোষণ করছেন।

দ্বিতীয় প্রকার শুফআর দলীল

জাবির রা. থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, 'প্রতিবেশী তার শুফআর অধিক হকদার। সে যদি অনুপস্থিতও থাকে, তার জন্য অপেক্ষা করা হবে– যদি উভয়ের যাতায়াতের একই রাস্তা হয়।'[৮] রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, 'ঘরের প্রতিবেশী ঘর ও জমীনের অধিকতর হকদার। যদি সে অনুপস্থিতও থাকে, তার জন্য অপেক্ষা করা হবে যখন তাদের উভয়ের রাস্তা এক ও অভিন্ন হবে।' আল্লামা যাইলাঈ র. বলেন, এ হাদীস খানা মূলত দুটি হাদীসের সমন্বয়ে গঠিত হয়েছে। এর প্রথমাংশ আবু দউদ র., তিরমিযি র., নাসায়ী র., আহমাদ র., হতে নিম্নোক্ত ভাষায় বর্ণিত হয়েছে, 'ঘরের প্রতিবেশী ঘর ও জমীনের অধিকতর হকদার।

'হাদীসখানার অবশিষ্টাংশ জাবের ইবনে আব্দুল্লাহ রা. হতে নিম্নোক্ত ভাষায় বর্ণনা করা হয়েছে, 'ঘরের প্রতিবেশী ঘরের সর্বাধিক হকদার। আর জমিনের প্রতিবেশী জমিনের সর্বাধিক হকদার। সে যদি অনুপস্থিতও থাকে তার জন্য অপেক্ষা করা হবে। কেননা যার অধিকার সাব্যস্ত হয়েছে অনুপস্থিত থাকার দরুন তার অধিকার বাতিল হবে না।

তৃতীয় প্রকার শুফআর দলীল

উপরোক্ত দ্বিতীয় প্রকার উপস্থাপিত হাদীস দ্বারা প্রতিবেশী শুফআর অধিকারী হওয়াও প্রসংগত সাব্যস্ত হয়েছে। প্রতিবেশী শুফআর অধিকারী হওয়ার ব্যাপারে নিম্নোক্ত হাদীসখানা সবিশেষ প্রণিধানযোগ্য, 'প্রতিবেশী তার সাকাবের অধিক হকদার। জিজ্ঞাসা করা হলো, হুজুর। সাকাব কি? তিনি জবাবে বললেন, 'সাকাব তার শুফআ।'[৯]

শফীর স্তরবিন্যাস

প্রথমত : প্রথম শ্রেণী শুফআর অধিকারী হবে। সে যদি শুফআর দাবিদার না হয়, তা হলে দ্বিতীয় শ্রেণী এর অধিকারী হবে। আর সেও যদি দাবিদার না হয় তবে তৃতীয় প্রকারের লোক তথা প্রতিবেশী এর হকদার হবে। উদাহরণস্বরূপ একটি জমিনে দুজন অংশীদার যৌথভাবে মালিক ছিল। তাদের একজন অংশীদার তার অংশ অন্যত্র বিক্রি করে দিল। এমতাবস্থায় প্রথমত এ জমির অপর অংশীদার শুফআর অধিকারী হবে। যদি সে তার অধিকারের দাবি নিয়ে এগিয়ে না আসে, তবে তার শুফআ বাতিল হবে। ঐ স্থানে হুকুকের কোন অংশীদার তথা দ্বিতীয় প্রকারের অধিকারী থাকলে সে তার দাবি নিয়ে এগিয়ে আসতে পারে। সেও যদি এগিয়ে না আসে তবে প্রতিবেশী শুফআর অধিকারী হবে। অর্থাৎ উপরে উল্লেখিত ক্রমধারা অনুযায়ী তাদের অধিকার সাব্যস্ত হবে।

যে সমস্ত বস্তুতে শুফআর অধিকার সাব্যস্ত এবং যাতে সাব্যস্ত হয় না

প্রথমত : শুফআর অধিকার একমাত্র বৈধ ও প্রকৃত বিক্রয় সম্পূর্ণ হওয়ার পরই সৃষ্টি হয়। হেবা, সাদকা, ওয়াকফ ও ইজারা বা অন্য কোনও ভাবে হস্তান্তর হলে এ অধিকার সৃষ্টি হয় না। যে স্থানকে মহর ধার্য করে পুরুষ বিবাহ করে বা স্ত্রী স্বামীর সাথে খোলা করে অথবা যে স্থানের বিনিময়ে অন্য কিছু ভাড়া নেয় বা খুনী খুনের দিয়্যত হিসাবে দেয় অথবা যে স্থানের বিনিময়ে গোলাম আজাদ করা হয় তাতে শুফআ সাব্যস্ত হয় না। শুফআ শুধুমাত্র স্থাবর সম্পত্তির বেলায় প্রযোজ্য। যেমন জমি, ঘরবাড়ি, দোকান-পাট ও বাগ-বাগিচা ইত্যাদি। অস্থাবর সম্পদ যেমন ব্যবহার্য সামগ্রী ও জন্তু-জানোয়ারের মধ্যে শুফআর অধিকার সাব্যস্ত হয় না। অধিকাংশ আলেম এ অভিমতই পোষণ করেন। ইমাম নববী বলেন, 'অস্থাবর সম্পত্তিতে শুফআ সাব্যস্ত হবে না। চাই তা একাকী বিক্রি করা হোক অথবা এর সাথে জমিনও বিক্রি করা হোক। পক্ষান্তরে জমিনের মধ্যে শুফআ সাব্যস্ত হবে চাই শুধু জমিই বিক্রি করা হোক, অথব এর সাথে অস্থাবর কিছুও বিক্রি করা হোক।[১০] ইমাম শাফেয়ী র. ও মালেকী মতাবলম্বীদের মতে প্রত্যেক বস্তুর মধ্যে শুফআ সাব্যস্ত হবে। প্রকৃত পক্ষে শুফআর উদ্দেশ্য হলো অসৎ প্রতিবেশীর ক্ষতির হাত থেকে রেহাই পাওয়া, তাই শুফআর অধিকার স্থায়ী প্রকৃতির জিনিসের মধ্যেই হবে। সব জিনিসের মধ্যে শুফআর অধিকার প্রয়োগ করা হলে উল্টো সামাজিক বিশৃঙ্খলা দেখা দেবে। জমি বন্টন যোগ্য হোক অথবা না হোক তাতে শুফআ সাব্যস্ত হবে। বন্টন যোগ্য যথা বাড়ি, জমি, হোটেল, ঘর, খেত-খামার ও বাগান ইত্যাদি। অবন্টনযোগ্য যথাঃ গোসলখানা, কুপ, নালা, অতি ক্ষুদ্র ঘর ইত্যাদি। তবে ইমাম শাফেয়ী র. বলেন, যা বন্টনযোগ্য নয় তাতে শুফআ সাব্যস্ত হয় না। কেননা শুধুমাত্র বন্টনের কষ্ট লাঘবের জন্য শুফআ সাব্যস্ত হয়েছে। আর বন্টনযোগ্য নয় তাতে বন্টনের কষ্ট আবশ্যক হয় না। এখানেও একই কথা প্রণিধানযোগ্য যে প্রতিবেশীর কষ্ট লাঘবই শুফআর মূল উদ্দেশ্য। এ দৃষ্টিতে অবন্টনযোগ্য বিবেচ্য নয়।

শুফআর অধিকার প্রয়োগের নিয়ম

যিনি শুফআ অধিকার প্রয়োগ করতে চান তাকে অবশ্যই নিম্নলিখিত নিয়ম পালন করতে হবে। শুফআ দাবি করার তিনটি নিয়ম পাওয়া যায়। এক. বিক্রয়ের খবর জানার পরপরই শুফআর দাবি করতে হবে। একে তলব-ই মুয়াসিবাত বলে। এমনকি বিক্রিয় সম্পর্কে অবহিত হওয়ার পর যদি তাৎক্ষণিক শফী শুফআর দাবি না করে তাহলে শুফআ বাতিল হবে। দুই. মজবুতীর দাবি তথা সাক্ষী নিয়োগ করা। অর্থাৎ দাবি করার সংগে সংগে দাবিকে আনুষ্ঠানিক রূপদান করার নিমিত্তে সাক্ষী নিয়োগ করা। একে তলব-ই-ইশহাদ বলা হয়। তিন. আইনের আশ্রয় নিতে হবে। একে তলব-ই-খুছুমাত বলা হয়। শফী তার প্রতিনিধির মাধ্যমেও শুফআর দাবি জানাতে পারে। শফী যদি নাবালক হয়, তবে তার অভিভাবক তলব করতে পারবে। দূরে অবস্থান করার কারণে পত্র মারফত তলব করতে পারে। দুই বা ততোধিক শফী হলে প্রত্যেককেই পৃথকভাবে তলব করতে হবে।

শুফআর অধিকার বিনষ্ট হয়

০ শফী জমি বিক্রি সম্পর্কে অবগত হওয়ার পর সাক্ষী নিয়োগ করার ক্ষমতা থাকার পরও যদি তা না করে তবে শুফআ বাতিল হবে। কেননা এটি শুফআর প্রতি অনাগ্রহের প্রমাণ। আর যদি এমন অবস্থায় থাকে যে, সত্যিই সে সাক্ষী নিয়োগ করতে পারছে না তবে শুফআ বাতিল হবে না।

০ শুফআ দাবি করার পর বিচারকের ফয়সালার পূর্বেই যদি শফী মৃত্যুবরণ করে তবে হানাফী মতে শুফআ বাতিল হবে। তবে ইমাম শাফেয়ীর মতে শফীর মৃত্যুতে শুফআ বাতিল হবে না। বরং অন্যান্য সম্পদের ওয়ারিশগণ যেভাবে উত্তরাধিকার হয় শুফআতেও তদ্রূপ উত্তরাধিকারী হবে। শুফআর উদ্দেশ্য হলো অসৎ প্রতিবেশীর ক্ষতির হাত থেকে রেহাই পাওয়া। এ প্রেক্ষিতে শুফআর অধিকার উত্তরাধিকারীগণও প্রয়োগ করতে পারে। সুতরাং শফীর মৃত্যুতে শুফআ বাতিল না করে তার উত্তরাধিকারীগণকে এ অধিকার প্রয়োগের সুযোগ দেয়া আমার মতে শ্রেয়।

০ যদি শফীর শুফআ দাবি করার পর ক্রেতা মৃত্যুবরণ করে তাহলে শুফআ বাতিল হবে না। কেননা ক্রেতার মৃত্যুতে শফীর অধিকার ও কারণ পরিবর্তিত বা বিলুপ্তি ঘটে না। অর্থাৎ মালিকানাধীন বাড়ি হতে শফীর অধিকার বিনষ্ট হয় না।

০ যদি বিক্রেতার উকীল বিক্রয় করে আর সে-ই শফী হয়, তবে শুফআ বাতিল হবে।

০ শফী যদি ক্রেতার সাথে কোন আপোষ-নিষ্পত্তি করে অথবা অন্য কোনভাবে বিক্রয়ের মৌন সম্মতি দান করে তবে শুফআর অধিকার বিনষ্ট হবে।

শুফআর পুনঃদাবী

০ শফী জানতে পারল যে জমি এক হাজার টাকায় বিক্রি হয়েছে এবং এত টাকা তার নেই। সুতরাং সে শুফআর দাবি ত্যাগ করল। পরে জানতে পারল যে, জমিটি তদপেক্ষা কমদামে বিক্রি হয়েছে। এমতাবস্থায় শফী দ্বিতীয়বার শুফআর দাবি করতে পারবে।

০ শফীকে বলা হলো যে, অমুক ব্যক্তি জমি খরিদ করেছে। এতে শফী শুফআর দাবি ছেড়ে দিল। অতপর জানা গেল যার নাম বলা হয়েছে মূলত সে ক্রেতা নয়। বরং ক্রেতা অন্যজন। এমতাবস্থায় শফীর শুফআর অধিকার বহাল থাকবে। কেননা মানুষের চরিত্র বিভিন্ন ধরনের হয়। কারো প্রতিবেশী হয় পছন্দনীয় আবার কারো প্রতিবেশী অপছন্দনীয় হয়। সুতরাং কারো জন্য শুফআ ছেড়ে দিলে অন্যের জন্য ছেড়ে দিতে হবে এমন কোন কথা নেই।

০ অর্ধেক জমি বিক্রির সংবাদ পেয়ে শফী তার শুফআর দাবি বর্জন করল। অতপর জানা গেল যে, সম্পূর্ণ জমি বিক্রয় হয়েছে। এমতাবস্থায় শুফআর অধিকার বহাল থাকবে। অপরদিকে সম্পূর্ণ জমি বিক্রয় হয়েছে এ খবর জানার পর শুফআর দাবির অধিকার বর্জন করল। পরে অর্ধেক জমি বিক্রির খবর পাওয়ার পর জাহের রেওয়ায়েত অনুযায়ী শুফআর অধিকারী হবে না। তবে ইমাম আবু ইউসুফ র. হতে এক বর্ণনানুযায়ী এ অবস্থায় শফী শুফআর অধিকারী হবে। কেননা, কোন কোন সময় অর্ধেক খরিদ করার মত টাকা হাতে থাকে। কিন্তু সম্পূর্ণ জমি ক্রয় করার টাকা হাতে নাও থাকতে পারে। ইমাম শাফেয়ী ও আহমদ র. এ অভিমতই ব্যক্ত করেন।

শুফআ রহিতকরণের কতিপয় কৌশল

কদাচিৎ শফী জালেম অপকর্মকারী ও অনিষ্টকারী হয়ে থাকে। তার কারণে প্রতিবেশীরা অতিষ্ট হয়ে পড়ে। কাজেই তার প্রতিবেশীরা তার প্রতিবেশী হওয়া থেকে পরিত্রাণ পেতে চায়। এমতাবস্থায় জালিম প্রতিবেশী থেকে পরিত্রাণের উদ্দেশ্যে কৌশল অবলম্বন করতে পারে। এজন্য হেদায়া গ্রন্থকার তিনটি কৌশলের কথা বলেছেন। প্রথম কৌশলঃ বাড়ি বিক্রয়ের সময় শফীর জমি সংলগ্ন লম্বালম্বিভাবে এক গজ ছেড়ে দিয়ে জমি বিক্রি করবে, এতে সে শুফআর দাবি করতে পারবে না। দ্বিতীয় কৌশল দুইবারে জমি বিক্রি করা। যাতে দ্বিতীয়াংশে প্রতিবেশী শুফআ দাবি না করতে পারে। তৃতীয় কৌশলঃ চড়া দামে জমি বিক্রি করবে, অতপর ঐ দামের পরিবর্তে এমন একখান কাপড় দিবে যার মূল্য জমির প্রকৃত মূল্যের সমান। এখানে শফীর শুফআ গ্রহণ করতে হলে চড়া মূল্য দিয়ে করতে হবে।[১১]

শুফআর কতিপয় আইন

১. বাড়ির উপর ও নিচ তলার মালিকের পারস্পরিক সম্পর্ক : কোন বাড়ির নিচ তলার আলাদা মালিক উপর তলার আলাদা মালিক সংলগ্ন প্রতিবেশী বলে গণ্য হবে, শরীক বলে গণ্য হবে না এবং উপর তলার আলাদা মালিক নিচের তলার সুবিধাদিতে অংশীদার বলে গণ্য হবে।[১২]

২. প্রাচীর ও এর নিচের ভূমিতে অংশীদার : যে ব্যক্তি বাড়ির প্রাচীরে ও প্রাচীরের নিচের ভূমিতেও অংশীদার সে বিক্রিত সম্পত্তিতেই 'অংশীদার' গণ্য হবে। তবে যদি নিচের ভূমিতে অংশীদার না হয় বরং শুধুমাত্র প্রাচীর নির্মাণে অংশীদার হয় তাহলে 'সংলগ্ন প্রতিবেশী' বলে গণ্য হবে। অতএব প্রাচীরের নিম্নস্থ ভূমির মালিক কেবলমাত্র প্রাচীর নির্মাণে অংশীদার ব্যক্তি থেকে 'শুফআর' অধিকার লাভের অগ্রাধিকার পাবে।[১৩]

৩. বিশেষ ও সাধারণ জলাশয় ও পথ : খালীত ফি হাক্কিল মবীয়: অর্থাৎ অধিকার ও সুবিধাদিতে অংশীদার শুধুমাত্র তখন শুফআর অধিকারী হবে, যখন পানি সেচের নালা এবং রাস্তা ব্যক্তিগত হয়।[১৪] খাছ (ব্যক্তিগত) রাস্তা হলো, যা সর্বসাধারণের যাতায়াতের জন্য উন্মুক্ত নয়। অর্থাৎ এটি এমনই সীমিত যে কোন দিক দিয়ে সাধারণ পথের সাথে যুক্ত নয়। আর খাছ বা ব্যক্তিগত পানি সেচের নালা হলো, যা সর্বসাধারণের নৌকা চলাচলের জন্য উন্মুক্ত নয়। বরং নির্দিষ্ট জমিতে পানি সেচের জন্য তা নির্ধারিত। সুতরাং ঐ নালা থেকে যারা পানি সেচ করে তারা সকলেই এ নালার অংশীদার হিসাবে গণ্য হবে। কোন রাস্তা যদি সাধারণ জনগণের জন্য উন্মুক্ত না হয় বরং প্রাইভেট হয় এবং সেটি থেকে আরেকটি ব্যক্তিগত পথ যা কিছুটা নীচু হয়ে প্রলম্বিত ও দীর্ঘ হয়, আর উক্ত পথের পাশে একটি জমি বিক্রি হয়, এমতাবস্থায় নীচু পথের বাসিন্দাগণই উক্ত জমির শুফআর মালিক হবে। পথের উজানের দিকের লোকেরা শুফআর অধিকারী হবে না। কোন নীচু রাস্তার দিকে তাদের পথ নয়। বরং নীচু রাস্তার অধিবাসীগণ উঁচু রাস্তা হয়ে সাধারণ পথে যায়। অপরদিকে উঁচু রাস্তার পার্শ্বে যদি কোন জমি বিক্রি হয়। তাহলে নীচু পথের অধিবাসীগণও শুফআর অধিকারী হবে।[১৫]

বঙ্গীয় প্রজাস্বত্ব আইনে শুফআ

১৮৮৫ সালের বঙ্গীয় প্রজাস্বত্ব আইনে শুফআর কোন বিধান ছিল না। ১৮৮৫ সালের বঙ্গীয় প্রজাস্বত্ব আইনে ১৯২৮ সালে সর্বপ্রথম সংশোধনীর মাধ্যমে ২৬(চ) ধারা সৃষ্টি করে কোন স্থিতিবান হোল্ডিং হস্তান্তর করলে সে উক্ত প্রজাকে উচ্ছেদ করার যে অধিকার তার ছিল তা উক্ত আইনে রহিত করা হয়। তাই তাকে একই আইনে ১৯২৮ সালে ২৬(চ) ধারায় শুফআর অধিকার প্রদান করা হয়। পরবর্তীতে ১৯৩৮ সালে সংশোধনী আইন দ্বারা সহশরীক প্রজাকে হোল্ডিংটির খণ্ড বা অংশ হস্তান্তর করা হলেও শুফআর অধিকার প্রদান করা হয়। এর উদ্দেশ্য ছিল হোল্ডিং একত্রিকরণে সাহায্য করা এবং পারিবারিক সম্পত্তি অন্যের হাতে চলে যাওয়া রোধ করা।[১৬] বর্তমানে বঙ্গীয় প্রজাস্বত্ব আইনের ২৬(চ) ধারা কার্যকর নেই। ১৯৫০ সালে জমিদারী উচ্ছেদ ও প্রজাস্বত্ব আইন পাশ করা হয় এবং উক্ত আইনের ৯৬ ধারায় কৃষি জমিতে শুফআর বিধান রাখা হয়েছে। ১৯৫৬ সালের ১৪ এপ্রিল এই আইন কার্যকর হয়। ১৯৪৯ সালের বঙ্গীয় অকৃষি প্রজাস্বত্ব আইনের ২৪ ধারায় অকৃষি জমিতে শুফআর বিধান রাখা হয়।[১৭] এ আইনের বিধানগুলো ইসলামের শুফআ আইনের বিধানগুলোর সাথে সামান্য কিছু অমিল ব্যতিরেকে প্রায় ক্ষেত্রেই মিল রয়েছে। এ ক্ষেত্রে ইসলামের শুফআ আইনই অধিক ফলপ্রসূ এবং যুক্তিযুক্ত। অন্যান্য মতাবলম্বী ও ধর্মাবলম্বীগণ ইসলামের শুফআ আইনটির অনুসরণ পূর্বক তাদের আইন প্রণয়ন করেছে।

শুফআ অনুপস্থিতির সামাজিক কুফল

অত্যন্ত দুঃখের বিষয় এই যে, শুফআ আইনটি ইংরেজী Pre emption নামেই অধিক পরিচিত থাকলেও এর সফল প্রয়োগ আমাদের সমাজ ব্যবস্থায় তেমন একটা পরিলক্ষিত হয় না। ফলে এক অংশীদার ও প্রতিবেশীকে অন্য অংশীদার বা প্রতিবেশীর মাধ্যমে নিগৃহীত হতে দেখা যায়। তাতে সামাজিক ভ্রাতৃত্ববোধ ও সংহতি মারাত্মকভাবে ব্যাহত হয়। শহরের চেয়ে গ্রামাঞ্চলে এর অনুপস্থিতির কুফল বেশি দেখা যায়। মানুষের আত্মীয়তার সম্পর্ককে নষ্ট করে দেয়। মৃত ব্যক্তির উত্তরাধিকারীগণের মধ্যে কোন কারণে মনোমালিন্য সৃষ্টি হলে তাদেরকে না জানিয়ে জমি অন্যত্র বিক্রি করে দেয়। শুফআর সফল প্রয়োগ না থাকায় অথবা দীর্ঘসূত্রিতার কারণে মজলুম মানবতা নিরবে নির্যাতন সয়ে যায়, তথাপি এ আইনের দ্বারস্থ হয় না। বিশেষ করে গ্রামাঞ্চলের একান্নভুক্ত পরিবারগুলো এর শিকার হচ্ছে এবং এজন্য খুনোখুনি ও রক্তাক্ত ঘটনা হরদমই ঘটছে। এমনটিও দেখা গেছে যে, অংশীদার বা প্রতিবেশী যাতে শুফআর দাবি করতে না পারে এজন্য বিক্রিত জমির অধিক ভুয়া মূল্য উল্লেখ করে জমি রেজিস্ট্রি করে থাকে। শুফআর সফল বাস্তবায়ন থাকলে এরও একটি প্রতিকার করা যেত। তাহলে সার্ভে রিপোর্টের ভিত্তিতে এলাকার বাজার মূল্য যাচাই করা যেতো। সমাজের অধিকাংশ মানুষের এ সম্পর্কে সুস্পষ্ট ধারণা নেই, সেখানে সংগতিপূর্ণ সহায়ক বা প্রতিবিধানের তো কোন প্রশ্নই আসতে পারে না। সামাজিক বিশৃংখলা, পারিবারিক ভাংগন ও আত্মীয়তার সম্পর্ক নষ্ট করা থেকে সমাজ ও সভ্যতাকে রক্ষা করতে হলে

শুফআ আইন সম্পর্কে সচেতনতা বৃদ্ধি করতে হবে। এবং উক্ত আইনে একক (Exclusive) শুফআ আদালত প্রতিষ্ঠা করা প্রয়োজন।

তথ্যপঞ্জি

১. হেদায়া, বুরহানুদ্দীন মুরগীনানী র., শুফআ পর্ব।
২. বিধিবদ্ধ ইসলামী আইন, প্রথম খণ্ড, পৃষ্ঠা ৫৫১, সংকলক মাওলানা মুহাম্মদ মূসা, মাওলানা মোঃ মোজাম্মেল হক, ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ।
৩. ইসলামী শরীয়তের উৎস, মাওলানা মুহাম্মদ আবদুর রহীম, খায়রুন প্রকাশনী, প্রথম প্রকাশ আগস্ট ১৯৯৪।
৪. অগ্রক্রয় আইন, ছিদ্দিকুর রহমান, পৃষ্ঠা ২৫, বাংলা সংস্করণ নিউ ওয়ার্সী বুক করপোরেশন, প্রথম প্রকাশ অক্টোবর ১৯৯৯ইং।
৫. সহীহ মুসলিম, ইমাম আবুল হুসাইন মুসলিম ইবনুল হাজ্জাজ র. বাংলা সংস্করণ, বাংলাদেশ ইসলামিক সেন্টার, ঢাকা, হাদীস নং ৩৯৮১ অনুচ্ছেদ : ২২, শুফআর বর্ণনা।
৬. সহীহ মুসলিম, ইমাম আবুল হুসাইন মুসলিম ইবনুল হাজ্জাজ র. বাংলা সংস্করণ, বাংলাদেশ ইসলামিক সেন্টার, ঢাকা হাদীস নং ৩৯৮২ অনুচ্ছেদ : ২২, শুফআর বর্ণনা।
৭. সহীহ মুসলিম, ইমাম আবুল হুসাইন মুসলিম ইবনুল হাজ্জাজ র. বাংলা সংস্করণ, বাংলাদেশ ইসলামিক সেন্টার, ঢাকা, হাদীস নং ৩৯৮৩ অনুচ্ছেদ : ২২, শুফআর বর্ণনা।
৮. জামে আত তিরমিযী, ইমাম আবু ঈসা তিরমিযি র., বাংলা সংস্করণ, বাংলাদেশ ইসলামিক সেন্টার, ঢাকা, হাদীস নং ১৩০৮। আবু ঈসা বলেন, হাদীসটি হাসান ও গরীব। আব্দুল মালেক ইবনে আবু সোলাইমান আতা জাবির রা. সূত্র ব্যতীত অপর কেউ এ হাদীস বর্ণনা করেছন বলে জানা নেই। এ হাদীসকে কেন্দ্র করে শোবা র. আব্দুল মালেক ইবনে সুলাইমানের সমালোচনা করেছেন। আব্দুল মালেক হাদীস বিশারদদের মতে বিশ্বস্ত ও নির্ভরযোগ্য রাবী। ইবনুল মোবারক বর্ণনা করেছেন, সুফিয়ান সাওরী বলেছেন, হাদীসের জ্ঞানের ক্ষেত্রে আব্দুল মালেক মানদণ্ডস্বরূপ। বিশেষজ্ঞ আলেমগণ এ হাদীস অনুযায়ী আমল করেছেন। তাদের মতে, অন্যদের তুলনায় প্রতিবেশীই শুফআর অধিক হকদার, সে উপস্থিত না থাকলেও। সে যখন ফিরে আসবে, তখন শুফআ দাবি করতে পারবে, সময়ের ব্যবধান যাই হোক না কেন।
৯. ইমাম বুখারী, নাসায়ী র. হযরত রাফে র. হতে হাদীস খানা বর্ণনা করেছেন।
১০. রওজাহ গ্রন্থ, ইমাম নববী র.।
১১. হেদায়া, বুরহানুদ্দীন মুরগীনানী র., শুফআ পর্ব।
১২. বিধিবদ্ধ ইসলামী আইন, প্রথম খণ্ড, পৃষ্ঠা ৫৫২, ধারা ৪৫১, সংকলক মাওলানা মুহাম্মদ মূসা, মাওলানা মোঃ মোজাম্মেল হক, ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ।
১৩. বিধিবদ্ধ ইসলামী আইন, প্রথম খণ্ড, পৃষ্ঠা ৫৫৩, ধারা ৪৫১,সংকলক মাওলানা মুহাম্মদ মূসা, মাওলানা মোঃ মোজাম্মেল হক, ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ।
১৪. হেদায়া, বুরহানুদ্দীন মুরগীনানী র., শুফআ পর্ব।
১৫. হেদায়া, বুরহানুদ্দীন মুরগীনানী র. শুফআ পর্ব।
১৬. অগ্রক্রয় আইন, ছিদ্দিকুর রহমান, পৃষ্ঠা ৫৩, বাংলা সংস্করণ, নিউ ওয়ার্সী বুক করপোরেশন, প্রথম প্রকাশ অক্টোবর ১৯৯৯ইং।
১৭. অগ্রক্রয় আইন, ছিদ্দিকুর রহমান, পৃষ্ঠা ৫৬, বাংলা সংস্করণ, নিউ ওয়ার্সী বুক করপোরেশন, প্রথম প্রকাশ অক্টোবর ১৯৯৯ইং।

ইসলামী আইন ও বিচার
জানুয়ারী-মার্চ ২০০৭
বর্ষ ৩, সংখ্যা ৯, পৃষ্ঠা : ৪২-৫১

রাষ্ট্র ও সরকার পরিচালনায় নারী নেতৃত্ব

মুহাম্মদ মূসা

ইসলামী আইনের অন্যতম বৈশিষ্ট হলো তার নমনীয়তা। ইসলামী শরীয়ত যে কোন বিষয়ে সাধারণভাবে প্রযোজ্য একটি বিধান বিধিবদ্ধ করে। অবস্থা-পরিবেশ-পরিস্থিতি প্রভৃতি স্বাভাবিক থাকলে সংশ্লিষ্ট বিধানও স্বাভাবিকভাবে কার্যকর বা প্রযোজ্য হয়। কিন্তু অবস্থা-পরিবেশ-পরিস্থিতি ইত্যাদিতে ব্যতিক্রম ঘটলে বিধান প্রয়োগের ক্ষেত্রে তা অবশ্যই বিবেচনায় রাখতে হয়। উদাহরণস্বরূপ ইসলামী শরীয়তে মৃতজীব, শূকর, রক্ত এবং আল্লাহ ছাড়া অন্য কিছুর নাম নিয়ে জবাই করা হালাল প্রাণী আহার করা মুসলমানদের জন্য হারাম (অলংঘনীয়ভাবে নিষিদ্ধ) ঘোষণা করা হয়েছে।[১]

কিন্তু অবস্থা-পরিবেশ-পরিস্থিতির ব্যতিক্রম ঘটলে অর্থাৎ কোন মুসলমান একান্ত নিরুপায় অবস্থায় পতিত হলে এবং হালাল খাদ্যদ্রব্য সংগ্রহ করার মত সুযোগ না থাকলে জীবন বাঁচানোর জন্য ঐসব অলংঘনীয় হারাম বস্তু আহার করতে তাকে অনুমতি দেয়া হয়েছে (দ্র. পূর্বোক্ত আয়াত)। এটাই হলো ইসলামী আইনের বৈশিষ্ট। সর্বক্ষেত্রেই আমরা তার এই বৈশিষ্ট বা নমনীয়তা লক্ষ করি।

আল্লাহ তাআলা এই পৃথিবী পরিচালনার দায়িত্বভার মানুষের উপর অর্পণ করেছেন।[২] আবার মানুষের দুই লিংগ অর্থাৎ নারী ও পুরুষ উভয়ের পরিচালনার নেতৃত্বভার অর্পণ করা হয়েছে পুরুষের উপর। 'পুরুষরা নারীদের কর্তা'[৩] অর্থাৎ কর্তৃত্ব ও নেতৃত্বভার পুরুষদের উপর অর্পণ করা হয়েছে। এটি হলো ইসলামী আইনের সংশ্লিষ্ট (কর্তৃত্ব-নেতৃত্ব) প্রসঙ্গের স্বাভাবিক অভিব্যক্তি। আমরা সমগ্র পৃথিবীর ইতিহাসের দিকে দৃষ্টিপাত করলে দেখতে পাই, আবহমান কাল থেকে সমাজের সর্বক্ষেত্রে স্বাভাবিকভাবে পুরুষরাই নেতৃত্ব দিয়ে আসছে। এমনকি গত বিশ শতকের ইতিহাসের দিকে তাকালেও একই চিত্র দৃষ্টিগোচর হয়। শুধু মুসলিম বিশ্বেই নয়, পাশ্চাত্যের খৃস্টান বিশ্বের অবস্থাও তাই। সেখানেও অদ্যাবধি সমাজের সার্বিক ক্ষেত্রে পুরুষরাই নেতৃত্ব দিয়ে আসছে এবং সেখানকার নারী সমাজ বিনাবাক্য ব্যয়ে তা মান্য করে আসছে।

তবে এর কিছু ব্যতিক্রমও আছে। যুগে যুগে বিভিন্ন সমাজে কতক নারীও নেতৃত্বের আসন অলংকৃত করেছেন। এমনকি এক যুদ্ধে মহানবী স. এর স্ত্রী আয়েশা রা. সেনাপতির দায়িত্ব পালন করেছেন। তাঁর নেতৃত্বে মহনবী স. এর অনেক খ্যাতিমান পুরুষ সাহাবী ঐ যুদ্ধে অংশগ্রহণ করেছেন। ইসলামী শরীয়ত এ ধরনের ব্যতিক্রম মেনে নেয়।

লেখক : একটি স্বায়ত্তশাসিত প্রতিষ্ঠানের গবেষণা কর্মকর্তা।

কোন নারী যদি তার প্রতিভাবলে, মেধায়, যোগ্যতায়, নেতৃত্বের গুণাবলীতে বিভূষিত হয়ে আবির্ভূত হন তবে ইসলামী শরীয়ত তার এই যোগ্যতার কদর করে, তাকে পিছনে ঠেলে দেয় না, বরং তার সহায়তা করে। আসলে যোগ্যতাবলে কেউ উন্নতির দিকে ধাপে ধাপে অগ্রসর হলে তাকে প্রতিরোধ করা যায় না, সে পুরুষই হোক বা নারী। ইসলামী সমাজেও কোন নারী এভাবে নেতৃত্বের আসনে চলে এলে সমাজ তাকে গ্রহণ করে এবং শুধু নারী হওয়ার সুবাদে তাকে পিছনে হটিয়ে দেয় না। মুসলিম রাষ্ট্র ও সরকারের সর্বোচ্চ পদে এই ব্যতিক্রমী যোগ্যতার অধিকারী মহিলাকে সমাসীন হতে ইসলামী আইন বাধা দেয় না। যুগে যুগে মুসলিম উলামা নেতৃত্বের এই ব্যতিক্রমকে অনুমোদন করেছেন। এখানে আমরা হিমালয়ান উপমহাদেশের বিশ শতকের কয়েকজন সুপ্রসিদ্ধ আলেমের এই সম্পর্কিত অভিমত পত্রস্থ করা হলো।

রাষ্ট্রপ্রধান পদে মহিলা

বর্তমান পরিস্থিতিতে রাষ্ট্র ও সরকার প্রধান পদে মহিলার নির্বাচন জায়েয। বিশ্ববিখ্যাত ও দেশবরেণ্য ওলামায়ে কেরামের ফতোয়া :

১. মাওলানা আশরাফ আলী থানভী র.
২. মওলানা সৈয়দ সুলায়মান নদভী র.
৩. মাওলানা মুফতী মোহাম্মদ শফী র.
৪. মাওলানা সাইয়েদ আবুল আলা মওদূদী র.
৫. মাওলানা আতহার আলী র.
৬. মাওলানা শামছুল হক (ফরিদপুরী) র.
৭. মাওলানা নূর মোহাম্মদ আযমী র.
৮. মাওলানা তাজুল ইসলাম র.
৯. শর্ষিণার পীর শাহ্ মাওলানা মোহাম্মদ ছিদ্দিক র.
১০. মাওলানা মুহাম্মদ আবদুর রহীম র.

১. **হাকীমুল উম্মত মাওলানা আশরাফ আলী থানভী র.** ভারতের উত্তর প্রদেশের মুযাফ্ফর নগর জেলার অন্তর্গত থানাভবনে ১২৮০ হিজরী/ ১৮৬২ খৃ. ১৪ মার্চ জন্মগ্রহণ করেন। উচ্চতর শিক্ষালাভের জন্য তিনি ১২৯৫ হি./১৮৭৮ খৃ. 'দারুল উলূম দেওবন্দ' মাদরাসায় ভর্তি হন এবং পাঁচ বছর অধ্যয়নের পর হাদীস-তাফসীরসহ বিভিন্ন বিষয়ে উচ্চতর ডিগ্রি অর্জন করেন। রাজনৈতিক ক্ষেত্রে দেওবন্দপন্থী আলেমগণের একটি দল তাঁর নেতৃত্বে পাকিস্তান আন্দোলন সমর্থন করে। তিনি আল-কুরআনের তাফসীরসহ অসংখ্য গ্রন্থের রচয়িতা। তিনি ছিলেন এই উপমহাদেশের একজন প্রভাবশালী শীর্ষস্থানীয় আলেম। তিনি ১৩৬২ হি./ ১৯৪৩ খৃ. ১৯ জুলাই থানাভবনে ইনতিকাল করেন।

মাওলানা আশরাফ আলী থানভী র. বলেন : রাষ্ট্র ব্যবস্থা তিন প্রকার– রাজতান্ত্রিক, একনায়কতান্ত্রিক ও গণতান্ত্রিক। গণতান্ত্রিক রাষ্ট্র ব্যবস্থায় সদস্যদের সমবায়ে গঠিত পরিষদই রাষ্ট্রের প্রকৃত শাসনকর্তা। রাষ্ট্রপ্রধান এ পরিষদের একজন সদস্য মাত্র। তিনি জাতি কর্তৃক মনোনীত বা নির্বাচিত হলেও তাঁর পূর্ণ কর্তৃত্ব এখানে নেই। প্রকৃত প্রস্তাবে তিনিও পরিষদের অন্যান্য সদস্যদের মত একজন পরামর্শদাতা মাত্র। যদিও তাঁর মত অন্যান্য একক সদস্যের মতের তুলনায় অগ্রাধিকার লাভ করে থাকে তবুও এতে তাঁর পূর্ণ কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠিত হয় না। যদি তাই হতো তবে অন্যান্য সদস্যদের সমবেত মতের বিরুদ্ধে তাঁর মতামতই প্রাধান্য লাভ করতো; কিন্তু বাস্তবে তা কখনও হয় না।

কুরআন মজীদে হযরত বিলকিসের রাজত্ব কাহিনী বর্ণনা প্রসঙ্গে তাঁর কথার উদ্ধৃতি দিয়ে বলা হয়েছে.... মা কুনতু কাতেয়াতান আমরান হাত্তা তাশহাদূন' অর্থাৎ বিলকিস তাঁর সভাসদগণকে বলেন, 'আপনাদের উপস্থিতি ছাড়া আমি কোন বিষয়ে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করি না।' এ উক্তি থেকে প্রমাণিত হচ্ছে যে, সে রাষ্ট্রের রাষ্ট্রীয় পদ্ধতি শাসনতন্ত্র অনুসারেই হোক বা বিলকিসের স্বাভাবিক অনুসৃত রীতি অনুসারেই হোক গণতান্ত্রিক পদ্ধতির অনুরূপই ছিল।

হযরত বিলকিসের মুসলমান হবার পর তাঁর রাষ্ট্রাধিকার কেড়ে নেবার কোন প্রমাণ নেই, বরং তার রাজ্য যে আগের মতই বহাল ছিল, ইতিহাসে তার যথেষ্ট প্রমাণ রয়েছে। বিলকিসের রাজত্ব ও রাজ্যশাসন পদ্ধতির প্রতি পবিত্র কুরআনে কোনরূপ অবজ্ঞা বা অসমর্থন জ্ঞাপন করা হয়নি। উসূলে ফিক্হর সুবিদিত বিধান হচ্ছে, কুরআন বা হাদীসে যদি অতীতের কোন ঘটনা বা ব্যবস্থার প্রতি কোনরূপ অবজ্ঞা বা অসমর্থন প্রকাশ না করে বর্ণনা করা হয় তবে তা শরীয়তে প্রমাণ হিসেবে গৃহীত হতে পারে। সুতরাং কুরআনের বর্ণনা থেকে সুস্পষ্টভাবে প্রমাণিত হচ্ছে যে, গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রব্যবস্থায় মহিলার নেতৃত্ব চলতে পারে।[৪]

২. **আল্লামা সাইয়্যিদ সুলায়মান নদভী র.** ভারতের পাটনা জেলার দিসনা গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন ১৩০২ হি./ ১৮৮৪ খৃ. নভেম্বর মাসে। তিনি লাখনৌর দারুল উলূম নাদওয়া থেকে উচ্চতর ডিগ্রি লাভ করেন। ছাত্রজীবন থেকেই তিনি ছিলেন প্রতিভাধর লেখক। তাঁর রচিত গ্রন্থাবলী বিশ্বব্যাপী ব্যাপক জনপ্রিয়তা লাভ করে। তিনি ছিলেন শিবলী নোমানীর একান্ত সহচর। মাওলানা শিবলীর ইনতিকালের পর 'সীরাতুন নবী' শীর্ষক গ্রন্থখানির অসমাপ্ত রচনা তিনি সমাপ্ত করেন। এই মনীষী ১৯৫৩ খৃ. ২২ নভেম্বর মৃত্যুবরণ করেন। তাঁর প্রদত্ত অভিমত নিম্নরূপ।

আল্লামা সাইয়্যিদ সুলায়মান নদভী বলেন : রাষ্ট্রপ্রধানের দায়িত্ব পালনের জন্য ইসলাম যেসব শর্তারোপ করেছে তা পালন করা কোন মহিলার পক্ষে দুঃসাধ্য। এজন্যই নারী জাতিকে রাষ্ট্রপ্রধানের দায়িত্ব থেকে অব্যাহতি দেয়া হয়েছে। কিন্তু শুধু এই একমাত্র কারণে যদি কেউ মনে করেন যে, কোন অবস্থায়ই মহিলা মুসলমানদের সামরিক ও রাজনৈতিক নেতৃত্ব দিতে পারেন না তবে তা ভুল হবে। কারণ যখন জাতি কোন ফিতনা-ফাসাদের সম্মুখীন হয় এবং সে ফিতনা থেকে

রক্ষা করতে পারে এমন কোন ব্যক্তিত্ব জনগণের দৃষ্টিতে কোন মহিলা ছাড়া আর কেউ না থাকে তবে উক্ত মহিলাকেই জাতির নেতৃত্ব প্রদান করতে হবে।[৫]

৩. মুফতী মুহাম্মদ শফী র. ১৩১৪ হি./ ১৮৯৬ খৃ. ভারতের দেওবন্দ শহরে জন্মগ্রহণ করেন। তিনি ছিলেন অত্যন্ত প্রখর মেধার অধিকারী। ১৩৩৫ হি. সালে তিনি দারুল উলূম দেওবন্দ থেকে উচ্চতর ডিগ্রি লাভের পর এখানেই অধ্যাপনায় নিয়োজিত হন। পাকিস্তান আন্দোলনে যোগদানের কারণে তাঁকে দারুল উলূম দেওবন্দের শিক্ষকতা থেকে পদত্যাগ করতে হয়। পাকিস্তান প্রতিষ্ঠার পর ১৯৪৮ খৃ. তিনি পাকিস্তানে চলে আসেন এবং করাচী শহরে বসবাস করেন। তিনি উল্লেখযোগ্য কয়েকটি গ্রন্থের প্রণেতা। ১৩৯৬ হি./ ১৯৭৬ খৃ. অক্টোবর মাসে করাচীতে এই মহান মনীষী মৃত্যুবরণ করেন। তাঁর অভিমত নিম্নে প্রদত্ত হলো।
মুফতী মুহাম্মদ শফী বলেন : গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রে মহিলা রাষ্ট্রপ্রধান হওয়া ইসলামী শিক্ষা ও ঐতিহ্যের খেলাফ নয়।[৬]

৪. মাওলানা সাইয়েদ আবুল আলা মওদূদী র. ছিলেন মুসলিম বিশ্বের বিখ্যাত আলেম, অনন্য ইসলামী চিন্তাবিদ, বিশ শতকে ইসলামী বিষয়ের একজন প্রধান ব্যাখ্যাতা, উপমহাদেশের একজন ন্যায়নিষ্ঠ রাজনীতিবিদ, ইসলামী জ্ঞান-বিজ্ঞানের প্রায় সকল বিষয়ে অতি উচ্চ মানের বহু গ্রন্থ প্রণেতা, একজন শক্তিশালী উর্দূ গদ্য লেখক, সুবক্তা, নির্ভীক সাংবাদিক এবং জামায়াতে ইসলামী নামের ইসলামী সংগঠনের প্রতিষ্ঠাতা। তিনি ভারতের হায়দরাবাদ রাজ্যের আওরঙ্গাবাদে ১৩২১ হি./ ১৯০৩ খৃ. ২৫ সেপ্টেম্বর জন্মগ্রহণ করেন। তিনি ১৯১৪ খৃ. আওরঙ্গাবাদের ফাওকানিয়া মাদরাসা থেকে ফাযিল ডিগ্রি লাভ করেন, অতঃপর উচ্চতর শিক্ষা লাভের জন্য হায়দরাবাদের দারুল উলূম মাদরাসায় ভর্তি হন। কিন্তু পিতার মারাত্মক অসুস্থতার দরুন ছয় মাস পরই তাঁকে উক্ত মাদরাসা ত্যাগ করতে হয়। পরবর্তী পর্যায়ে দিল্লীতে বিভিন্ন উস্তাদের কাছে তিনি সিহাহ সিত্তা গ্রন্থ পাঠ সমাপ্ত করেন। তিনি তাঁর শিক্ষা সম্পূর্ণ আত্মপ্রচেষ্টা, কঠোর সাধনা ও অধ্যবসায়ের গুণেই অর্জন করতে সক্ষম হন। তিনি ২২ সেপ্টেম্বর, ১৯৭৯ খৃ. আমেরিকার বাফেলো হাসপাতালে মৃত্যুবরণ করেন। তাঁর অভিমত নিম্নে প্রদত্ত হলো।
মাওলানা সাইয়েদ আবুল আলা মওদূদী বলেন : এখন আমি এমন একটি বিষয়ে বলবো, যা খুব জোরেশোরে উত্থাপিত হচ্ছে এবং কিছু সংখ্যক আলেম ও পীরদের দ্বারাও তা লোকসমক্ষে প্রচার করানো হচ্ছে। তা হলো মহিলাকে রাষ্ট্রপ্রধান নিযুক্ত করা। বলা হচ্ছে যে, ইসলামে কোন নারীকে মুসলমানদের নেতা বা রাষ্ট্রপ্রধান বানানো যায় না। এই ব্যাপারে বিশেষ করে আমার লেখা বই থেকে নানা উদ্ধৃতি পেশ করা হচ্ছে। আর আমি সময় ও সুযোগ দেখে ইসলামের নীতি পরিবর্তন করে ফেলি বলে আমার নামে অভিযোগ তোলা হচ্ছে। এর জওয়াবে আমি অবশ্যই জিজ্ঞেস করতে পারি যে, ইসলামের দৃষ্টিতে নারীকে মন্ত্রী ও পার্লামেন্টারী সেক্রেটারী এবং বিদেশে রাষ্ট্রদূত বানানো যায় কি? ছেলে ও মেয়েদের সহশিক্ষা ব্যবস্থা কি ইসলাম সম্মত? পুরুষ ও নারীর একত্র

হয়ে একই অফিসে কাজ করা কি জায়েয? স্টেজে নেমে মেয়েদের নাচ, গান করা কি ইসলাম সমর্থন করে? উড়োজাহাজে যুবতী মেয়েরা সেবিকা হয়ে পুরুষ যাত্রীদের মধ্যে মদ পরিবেশন করে, তা কি জায়েয....আর এসব যদি না-জায়েয কাজই হবে তাহলে আজ পর্যন্ত এ ব্যাপারে ইসলামের নির্দেশ মেনে কাজ করা হয়নি কেন? এসব ব্যাপারে ইসলামের কথা স্মরণ হয়নি কেন? আর আজ নারীর রাষ্ট্রপ্রধান হওয়ার প্রশ্নেই কেবল ইসলামের দোহাই দেয়া হয় কেন? এ হচ্ছে পাল্টা প্রশ্ন। এর পরে আমি আসল বিষয়ে শরীয়তের দৃষ্টিভংগী আপনাদের সামনে পেশ করছি।

একথা সর্ববাদীসম্মত যে, ইসলামে রাজনীতি আর রাষ্ট্রীয় কার্যকলাপ নীতিগতভাবে পুরুষদের কর্মক্ষেত্রের আওতায় রাখা হয়েছে, এসবের দায়িত্ব পালনে মেয়েদের শরীক করা হয়নি। মুসলমানদের আমীর বা নেতা হবার জন্য যেসব শর্ত করা হয়েছে তার মধ্যে তার পুরুষ হওয়াও একটা শর্ত, একথা অস্বীকার করা যায় না। আমি নিজেই এ বিষয়ে দলিল-প্রমাণ সহকারে বলিষ্ঠভাবে ইতিপূর্বে কয়েকবারই বলেছি, আর আজও আমি এই কথারই পুনর্ঘোষণা করছি।

কিন্তু বর্তমান মুহূর্তে আমাদের সামনে বিষয়টি এত সাদাসিদাভাবে উপস্থিত হয়নি যে, কোন নারী মুসলমানদের আমীর হতে পারেন কিনা তা নিয়েই আমরা মাথা ঘামাতে বসবো। বরং আমরা বর্তমানে এক বিশেষ পরিস্থিতির সম্মুখীন হয়ে আছি, তা হচ্ছে এই :

০ দেশে এক জবরদস্তিমূলক অত্যাচারী ও স্বৈরাচারী শাসন ব্যবস্থা চালু হয়ে রয়েছে, তা আমাদের ধর্ম, চরিত্র, তাহজীব-তমদ্দুন ও অর্থনীতির পক্ষে অত্যন্ত মারাত্মক।

০ এ ধরনের শাসন ব্যবস্থাকে নিয়মতান্ত্রিক পন্থায় পরিবর্তন করার জন্য আগামী নির্বাচনে আল্লাহর দেয়া এক মহাসুযোগ পাচ্ছি।

০ দেশে মুহতারিমা ফাতিমা জিন্নাহ ছাড়া অপর কোন ব্যক্তিত্ব এমন নেই যাকে কেন্দ্র করে দেশের বিরাট সংখ্যক লোক একত্র হতে এবং নির্বাচনে সফলতা লাভ করতে পারে, আর এ উপায়ে বর্তমান স্বৈরতন্ত্রী জালেম শাসন ব্যবস্থাকে খতম করে দেয়ার কোন সম্ভাবনা থাকতে পারে।

০ মুহতারামা ফাতিমা জিন্নাহর প্রার্থী হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে দেশের সাধারণ জনতা তাঁর সমর্থনে কোমর বেঁধে দাঁড়িয়ে গিয়েছে।

০ তাঁর পরিবর্তে অপর কোন ব্যক্তিকে দাঁড় করানো কিংবা এই নির্বাচনী সংগ্রামে নিরপেক্ষ থাকার মানে বর্তমান প্রেসিডেন্ট আইয়ুব খানকেই সাহায্য করা।

এমতাবস্থায় আমাদের সামনে আসল প্রশ্ন হচ্ছে এই যে, একজন নারীর রাষ্ট্রপ্রধান হওয়া কি শরীয়তে এতই আপত্তিকর যে, তাঁকে সমর্থন না করে তার বিপরীত বর্তমান জবরদস্তি আর অত্যাচার-জুলুমের শাসনকে মেনে নিতে হবে? আমার মতে ইসলামী শরীয়ত সম্পর্কে সামান্য জ্ঞান রাখেন এমন কোন ব্যক্তিই বলতে পারে না যে, একজন নারীকে রাষ্ট্রপ্রধান করার পরিবর্তে এই স্বৈরাচারী ও জালেম শাসককে কবুল করা উচিত। বরং আমি তো বলবো, একজন নারীকে রাষ্ট্রপ্রধান বানানো যদি এক গুণ দোষের কাজ হয় তাহলে তার মুকাবিলায় বর্তমান অত্যাচারী ও জালেম শাসনকে বাঁচিয়ে রাখলে কমপক্ষে দশ গুণ বেশি গুনাহ হবে। আর আল্লাহর শরীয়ত তো

অনেক বড়, সাধারণ জ্ঞান-বুদ্ধি সম্পন্ন একটি বালকও এক টাকা বাঁচানোর জন্য দশ টাকার ক্ষতি স্বীকার করাকে পছন্দ করতে পারে না।

এছাড়া, একথাও মনে রাখতে হবে যে, ইসলামের সাধারণ নিয়ম অনুযায়ী রাষ্ট্রপ্রধানের পুরুষ হওয়া একটি শর্ত বটে, কিন্তু নারীর রাষ্ট্রপ্রধান হওয়া ইসলামী শরীয়তে সম্পূর্ণ হারাম– এমন হারাম যে, অত্যন্ত ও সাংঘাতিক প্রয়োজন দেখা দিলেও তা জায়েয হবে না, এমন কথা কেউই বলতে পারে না। কুরআন-হাদীস থেকে যদি কেউ তা প্রমাণ করতে পারেন তবে করুন, আমরাও দেখবো। আসলে ইসলামের সাধারণ নিয়মের মধ্যে আমরা কোনই পরিবর্তন করছি না, না তার কোন সংশোধন করার চেষ্টা করছি। কিন্তু বর্তমানের এই বিশেষ অবস্থায় অতিশয় প্রয়োজন দেখা দেয়ার কারণে একজন মহিলাকে রাষ্ট্রপ্রধান করা জয়েয মনে করছি মাত্র। কেননা এ কাজ যে চূড়ান্ত ও স্থায়ীভাবে হারাম– একথা প্রমাণ করার কোন দলিলই আমরা শরীয়তে পাইনি, এখন একজন নারীকে যদি আমরা মেনে না নেই, তাহলে তার অপেক্ষা বহু গুণ বেশি বড় অন্যায়কে মেনে নিতে হয় এবং তা এত বড় যে, শুধু নৈতিক দৃষ্টিতেই নয়, ইসলামের দৃষ্টিতেও তা অত্যন্ত বড় অন্যায় কাজ হয়ে পড়ে।

এর পরেও প্রশ্ন থেকে যায়। তা হচ্ছে এই যে, ইসলামে রাষ্ট্রপ্রধানের জন্য কেবল পুরুষ হওয়াই কি একমাত্র শর্ত?.....না সেই সঙ্গে আরো অনেক কয়টি শর্ত আছে? কোন এক বিশেষ সময়ে আমাদের সামনে যদি দুই ব্যক্তির মধ্যে একজনকে গ্রহণ করার প্রশ্ন দেখা দেয়, দু'জনের একজনকে অনিবার্যভাবে কবুল করে নিতে হয়, আর তাদের একজনের মধ্যে কেবল নারী হওয়া ছাড়া অন্য আপত্তিকর জিনিস না থাকে এবং অপরজনের মধ্যে কেবল পুরুষ হওয়া ছাড়া অন্য সর্বদিকই হয় মারাত্মকভাবে আপত্তিকর, তাহলে ইসলামের জ্ঞানসম্পন্ন কোন ব্যক্তি কি আমাদেরকে নারীকে গ্রহণ না করে সেই পুরুষকেই গ্রহণ করার জন্য বলতে পারেন?

ভাইগণ, নারীর রাষ্ট্রপ্রধান হওয়া সংক্রান্ত বিষয়ের শরীয়তের দৃষ্টিতে এই হচ্ছে প্রকৃত অবস্থা। এই কারণেই আমরা আসন্ন প্রেসিডেন্ট নির্বাচনে মুহতারামা ফাতিমা জিন্নাহকে সমর্থন করার সিদ্ধান্ত নিয়েছি। এক্ষণে আমি দেশবাসীর নিকট আকুল আবেদন করতে চাই, আপনারা দেশের অধিবাসীরা– কেউই যেন এই নাজুক ও জটিল সংকটের সময় গাফিল হয়ে বসে না থাকেন– এই সুবর্ণ সুযোগকে নিশ্চিন্ত হয়ে ঘরে বসে অতিক্রান্ত হতে না দেন। খুব শান্তভাবে ঠাণ্ডা মনে চিন্তা করে ফয়সালা করুন: বিগত ছয় বছর ধরে দেশবাসী যে অত্যাচার জুলুম নির্যাতন নিষ্পেষণের যাঁতাকলে নিষ্পেষিত হচ্ছে তাকেই কি স্থায়ী করে রাখতে চান? ......না একে পরিবর্তন করে এমন এক শাসন ব্যবস্থা কায়েম করার ইচ্ছা রাখেন, যাতে দেশবাসী এক স্বাধীন মর্যাদাসম্পন্ন জাতি হিসেবে জীবন যাপন করার সুযোগ পাবে ও নিজেদের যাবতীয় গুরুতর ব্যাপারে নিজেরাই ফয়সালা গ্রহণ করতে পারেন? প্রথম অবস্থা গ্রহণ করতে যদি আপনারা রাজী না হন, বরং এই দ্বিতীয় অবস্থাকেই দেশে বহাল করতে চান, তাহলে আল্লাহর ওয়াস্তে বলছি এই সুযোগ কিছুতেই হাতছাড়া করবেন না। আপনার ভোট পূর্ণ দৃঢ়তার সঙ্গে কেবলমাত্র সম্মিলিত বিরোধী দলের পক্ষে মুহতারামা

ফাতিমা জিন্নাহর নামে ব্যবহার করুন। এই সুবর্ণ সুযোগ যদি আপনারা হেলায় হারিয়ে ফেলেন, তাহলে আপনাকে এবং আপনার ভবিষ্যৎ বংশধরদের এর কুফল দীর্ঘকাল পর্যন্ত ভোগ করতে হবে।

আমি আল্লাহর নিকট দুআ' করছি, তিনি যেন আমাদের সকলকে সঠিক ও নির্ভুল পথ দেখান এবং ভুল পথে যাওয়া থেকে যেন তিনি আমাদেরকে রক্ষা করেন-আমীন।[৭]

৫. মাওলানা আতহার আলী র. আনু. ১৩০৮ বঙ্গাব্দ/ ১৮৯৪ খৃ. সিলেট জেলার বিয়ানী বাজারে জন্মগ্রহণ করেন। তিনি 'দারুল উলূম দেওবন্দ' মাদরাসা থেকে হাদীস ও তাফসীর শাস্ত্রে সর্বোচ্চ ডিগ্রি লাভ করেন। রাজনৈতিক জীবনে তিনি পাকিস্তান আন্দোলনে সক্রিয় ভূমিকা পালন করেন। তিনি ছিলেন তৎকালীন পূর্ব পাকিস্তান জমীয়তে উলামায়ে ইসলামের প্রাদেশিক সভাপতি। ১৯৫৪ খৃ. তিনি প্রাদেশিক পরিষদ ও কেন্দ্রীয় পরিষদের সদস্য (এম.এন.এ.) নির্বাচিত হন। ১৯৭১ সালে মুক্তিযুদ্ধের বিপক্ষে ও ভারতীয় আধিপত্যের বিরুদ্ধে ভূমিকা পালন করায় তিনি দৈহিক নির্যাতন ও কারাভোগ করেন। তিনি ১৩৮৩ বঙ্গাব্দ/ ১৯৭৬ খৃ. ময়মনসিংহে মৃত্যুবরণ করেন। রাষ্ট্রপ্রধান পদে নারীর নির্বাচন সম্পর্কে তাঁর অভিমত নিম্নরূপ।

মাওলানা আতহার আলী বলেন : দেশের বর্তমান পরিস্থিতিতে মুহতারামা ফাতেমা জিন্নাহকে রাষ্ট্রপ্রধান পদে ভোট দেওয়া যাইতে পারে না বলিয়া একশ্রেণীর আলেম ও পীর নামধারী স্বার্থবাজ ব্যক্তি পবিত্র কুরআন ও হাদীসের যে ধরনের বিকৃত উদ্ধৃতি ও অপব্যাখ্যা দান করিতেছেন তাহা আমি গভীর উদ্বেগের সহিত লক্ষ্য করিয়াছি। আরো পরিতাপের বিষয় এই যে, দেশের সরলপ্রাণ মুসলমানদের বিভ্রান্ত করার কুমতলবে ক্ষমতাসীন দলের পক্ষ হইতে সেইসব বিকৃত উদ্ধৃতি ও অপব্যাখ্যামূলক তথ্যের ভিত্তিতে অসংখ্য পুস্তক-পুস্তিকা ঘরে ঘরে বিলি বণ্টন করা হইতেছে।

এমতাবস্থায় খাঁটি ও সচেতন কোন আলেম ও পীরের পক্ষে কিছুতেই নিশ্চিন্ত বসিয়া থাকা উচিত নহে। আমি দীর্ঘদিন যাবৎ রোগশয্যায় শায়িত থাকিয়াও এইরূপ পরিস্থিতিতে গভীর উৎকণ্ঠা বোধ করিতেছি। এবং দেশের বর্তমান পরিস্থিতিতে একজন নারীকে রাষ্ট্রপ্রধান পদে ভোট দেওয়া জায়েয নহে বলিয়া যাহারা দাবি করিতেছেন, তাহাদিগকে উহা প্রমাণ করিবার জন্য আমি চ্যালেঞ্জ প্রদান করিতেছি।

পক্ষান্তরে আমি ঘোষণা করিতেছি যে, বর্তমান প্রেসিডেন্ট আয়ুব খান সাহেব যিনি পবিত্র কুরআনকে বিকৃত করিয়া বিভিন্ন ধরনের বিধান জারি করতঃ পবিত্র কুরআন ও সুন্নাহর চরম অবমাননা করিয়াছেন 'তাঁহাকে ভোট দেওয়া মুসলমানদের পক্ষে সম্পূর্ণ হারাম'।

এই ব্যাপারে কাহারও দ্বিমত থাকিলে তিনি ঢাকা ফরিদাবাদ এমদাদুল উলূম মাদরাসার ঠিকানায় আমার সহিত সাক্ষাৎ করিয়া বিতর্কে প্রবৃত্ত হইতে পারেন।[৮]

৬. মাওলানা শামছুল হক ফরিদপুরী র. ১৮৯৫ খৃ. ফরিদপুর জেলায় জন্মগ্রহণ করেন। তিনি দারুল উলূম দেওবন্দ মাদরাসা থেকে হাদীস-তাফসীরসহ বিভিন্ন বিষয়ে উচ্চতর ডিগ্রি লাভ করেন।

অতঃপর শিক্ষকতার পেশায় যোগদান করেন। তিনি বাংলাদেশের সর্বমহলে জনপ্রিয়তা অর্জনকারী বিশিষ্ট আলেম। তিনি বাংলা ভাষায় ইসলামী জ্ঞানের উন্মেষ ঘটাতে আপ্রাণ চেষ্টা করেন এবং বহু গ্রন্থ রচনা করেন। তিনি ঢাকার লালবাগ ও ফরিদাবাদ মাদরাসার প্রতিষ্ঠাতা। তাঁর জন্মস্থান গওহর ডাঙ্গা গ্রামে 'খাদেমুল ইসলাম মাদরাসা' প্রতিষ্ঠা করেন। বর্তমানে এটি দেশের একটি উচ্চতর শ্রেষ্ঠ শিক্ষা প্রতিষ্ঠান। তিনি ১৯৬৯ খৃ. মৃত্যুবরণ করেন।

৭. মওলানা নূর মোহাম্মদ আজমী র. ১৯০০ খৃ. ফেনী জেলার নেয়াজপুর গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। তিনি চট্টগ্রাম দারুল উলূম মাদরাসা থেকে উচ্চতর ডিগ্রি লাভ করেন, অতঃপর শিক্ষকতায় নিয়োজিত হন। কিছুকাল পর শিক্ষকতার পেশা ত্যাগ করে উচ্চতর অধ্যয়ন ও গবেষণায় নিয়োজিত হন। তিনি উল্লেখযোগ্য কয়েকখানি গ্রন্থের রচয়িতা। তিনি ছিলেন এতদঞ্চলের বিশিষ্ট আলেমে দীন এবং বিশ্বপরিস্থিতি সম্পর্কে সচেতন ব্যক্তিত্ব। তিনি ১৯৭১ সালে নিজ গ্রামে মৃত্যুবরণ করেন।

মাওলানা শামছুল হক ফরিদপুরী ও মাওলানা নূর মোহাম্মদী আজমী সাহেবদ্বয় বলেন : যে ব্যক্তি আল্লাহর শাশ্বত চিরন্তন দীনকে আধুনিকীকরণের প্রচেষ্টা চালাইতেছেন, যিনি মুসলিম পারিবারিক আইনের নামে স্বরচিত আইনের দ্বারা আল্লাহ ও রসূলের পবিত্র শরীয়তকে বিকৃত করিয়াছেন এবং ইদ্দত, তালাক ও বিবাহ ইত্যাদি ব্যাপারে কুরআনের সুস্পষ্ট আইনকে রহিত করিয়াছেন, তাঁহাকে পাকিস্তানের প্রেসিডেন্ট পদের জন্য সমর্থন করা কোন মুসলমানের পক্ষে জায়েয হইতে পারে না। এরূপ ব্যক্তির মোকাবেলায় এমন মহিলাকে প্রেসিডেন্ট করা কোনরূপেই অন্যায় হইবে না, যিনি এইরূপ শরীয়ত বিরোধী কাজ কখনও করেন নাই।[৯]

৮. মাওলানা তাজুল ইসলাম র. ১৩১৫ হি./ ১৮৯৬ খৃ. ব্রাহ্মণবাড়িয়া জেলার ভুবননগর গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। তিনি সিলেট সরকারি আলীয়া মাদরাসা থেকে সর্বো উচ্চ পরীক্ষায় প্রথম শ্রেণীতে প্রথম স্থান অধিকার করেন। অতঃপর ১৩৩৮ হি. দারুল উলূম দেওবন্দ মাদরাসা থেকে হাদীস-তাফসীরসহ বিভিন্ন বিষয়ে উচ্চতর ডিগ্রি লাভ করেন। তিনি কংগ্রেসপন্থী জমীয়াতে উলামায়ে হিন্দ-এর সাথে সম্পৃক্ত ছিলেন। পাকিস্তান আন্দোলনের শেষ পর্যায়ে মাওলানা শাব্বীর আহমাদ উসমানী র.-এর পরামর্শে তিনি পাকিস্তানপন্থী জমিয়াতে উলামায়ে ইসলাম দলে যোগদান করেন। তিনি ১৩৭৩ বঙ্গাব্দ/ ১৯৬৭ খৃ. ৩ এপ্রিল ঢাকায় মৃত্যুবরণ করেন। তাঁর প্রদত্ত ফতওয়া নিম্নরূপ।

মাওলানা তাজুল ইসলাম সাহেব বলেন :

বর্তমান প্রেসিডেন্ট নির্বাচনে যিনি প্রধান পুরুষ প্রার্থী–

১. তিনি জনসাধারণের ভোটাধিকার হরণ করিয়া পাকিস্তানে গণতন্ত্রের সমাধি রচনা করিয়াছেন।

২. তিনি পাকিস্তানকে ইসলামী গণতান্ত্রিক পথ হইতে সরাইয়া একনায়কত্বের পথে লইয়া যাইতেছেন।

৩. তিনি মুসলিম পারিবারিক আইন জারি করিয়া শরীয়তকে বিকৃত করিয়াছেন এবং ইদ্দত, তালাক, ইসলামের আধুনিকীকরণের প্রচেষ্টা চালাইয়া পবিত্র কুরআনের সুস্পষ্ট আইনকে রহিত করিয়াছেন। তাঁহাকে পাকিস্তানের প্রেসিডেন্ট পদের জন্য সমর্থন করা শরীয়তের দৃষ্টিতে কিছুতেই জায়েয হইতে পারে না। এতদসত্ত্বেও যাহারা তাহাকে সমর্থন করিবে, তাহারা ঐ ব্যক্তির যাবতীয় কৃতকর্মের গুনাহের সমঅংশী হইবে।

অপরপক্ষে যিনি মহিলা প্রার্থী–

১. তিনি পাকিস্তানের জন্মের পূর্বে ও পরে গণতন্ত্রের ধারক ও বাহক।

২. তিনি জনগণের ভোটাধিকার ফিরাইয়া দিতে ওয়াদাবদ্ধ।

৩. তিনি একনায়কত্বের অবসান ঘটাইয়া পূর্ণ গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠার ওয়াদা করিতেছেন।

৪. তিনি কুরআন ও সুন্নাহ মোতাবেক মুসলিম পারিবারিক আইনের অনৈসলামী ধারাসমূহ সংশোধন করার ওয়াদা করিতেছেন এবং পবিত্র শরীয়তকে রক্ষা করার অঙ্গীকার করিতেছেন।

জাতির এই পূর্ণ সংকটময় মুহূর্তে কুরআন বিকৃতকারী ও গণতন্ত্র হত্যাকারীকে অপসারণ করা অপরিহার্য কর্তব্য হইয়া দাড়াইয়াছে।

এই কার্য সম্পদান করিতে যদি কোন মহিলার আশ্রয় লওয়া হয়, তবে শরীয়তের দৃষ্টিতে তাহা নাজায়েয হওয়ার কোনই কারণ নাই। বরং তাঁহাকে জয়যুক্ত করার সর্বপ্রকার প্রচেষ্টা চালাইয়া যাওয়া অবশ্য কর্তব্য হইয়া পড়িয়াছে।[১০]

শর্ষিণার পীর মওলানা শাহ মোহাম্মদ ছিদ্দীক সাহেব বলেন : একনায়কত্বমূলক সরকার কর্তৃক ইসলাম ও শরীয়তে ইসলামের খেলাফ কতকগুলি কাজ হওয়ায় দেশের জনসাধারণ, বিশেষ করিয়া ওলামায়ে কেরাম ইহার বিরুদ্ধে প্রতিবাদ করিতে বাধ্য হইতেছেন। কিন্তু এই সরকার সেসবের প্রতি কর্ণপাত না করায় দেশের জনসাধারণ ও রাজনৈতিক চেতনাসম্পন্ন হককানী উলামায়ে কেরামের ক্রমবর্ধমান উদ্বেগ ও অসন্তোষের ফলে বিরোধী দলের নিয়মতান্ত্রিক আন্দোলন এবং ইসলাম ও জনসাধারণের স্বার্থে এই সরকার পরিবর্তনের সিদ্ধান্ত শরীয়তের দাবিতে একান্তই সময়োপযোগী ও শরীয়তসম্মত।

এই পরিপ্রেক্ষিতে দেশের চিন্তাশীল নেতৃবৃন্দ এবং উলামায়ে কেরামের সিদ্ধান্তকে আমি আন্তরিকভাবে সমর্থন জানাইতেছি এবং আগামী প্রেসিডেন্ট নির্বাচনের ক্ষেত্রে আমি আন্তরিকভাবে আবেদন জানাইতেছি যে, জনসাধারণ কর্তৃক অকুণ্ঠভাবে সমর্থিত সম্মিলিত বিরোধী দলকে ইসলামের মহান স্বার্থে কামিয়াব করুন।[১১]

১০. **মাওলানা মুহাম্মাদ আবদুর রহীম র.** খ্যাতনামা ইসলামী চিন্তাবিদ, সাহিত্যিক ও রাজনীতিবিদ। তিনি ১৩২৫ বঙ্গাব্দ/ ১৯১৮ খৃ. মার্চ মাসে পিরোজপুর জেলার কাউখালী থানাধীন শিয়ালকাঠি গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। তিনি শর্ষিনা আলীয়া মাদরাসা থেকে আলিম ও ফাযিল পাশ করার পর ১৯৪২ খৃ. কলিকাতা আলীয়া মাদরাসা থেকে কামিল ডিগ্রি লাভ করেন। তিনি ১৯৪৫

খৃ. জামায়াতে ইসলামীতে যোগদান করেন। তিনি অসংখ্য গ্রন্থ প্রণেতা এবং বাংলাদেশের সুপ্রসিদ্ধ আলেম। তিনি ১৯৮৭ খৃ. পয়লা অক্টোবর ঢাকায় মৃত্যুবরণ করেন। তাঁর প্রদত্ত অভিমত নিম্নরূপ: **মাওলানা মোহাম্মদ আবদুর রহীম সাহেব বলেন** : নারী রাষ্ট্রপ্রধান হওয়া জায়েয নয় বলিয়া শর্ষিণা হইতে সম্প্রতি যে ফতোয়া প্রকাশিত হইয়াছে, তাহা সম্পূর্ণ মনগড়া কথায় পূর্ণ। তাহাতে যেসব দলিলের উল্লেখ করা হইয়াছে, তাহার কোন একটি দ্বারাও একথা প্রমাণিত হয় না যে, নিতান্ত প্রয়োজনে ঠেকিয়াও কোন সময়ই নারীকে রাষ্ট্রপ্রধান করা শরীয়ত সম্মত নয়।[১২]

তথ্যপঞ্জি

১. সূরা আল-বাকারা : ১৭৩: সূরা আন-নাহল: ১১৫।

২. সূরা বাকারা : ৩০।

৩. সূরা নিসা : ৩৪।

৪. দৈনিক আজাদ, ২২শে অক্টোবর, ১৯৬৪ইং।

৫. সীরাতে আয়েশা, সুলায়মান নদভী, ৩য় খণ্ড, ১১৩ পৃষ্ঠা।

৬. দৈনিক জঙ্গ, উর্দু, ৩ নভেম্বর ১৯৬৪ইং।

৭. মুক্তিযুদ্ধের দলীল, ২য় খণ্ড, ২৪২-২৪৩ পৃষ্ঠা, ১ম সংস্করণ।

৮. মুক্তিযুদ্ধের দলীল, ষষ্ঠ খণ্ড, ২৪৩-২৪৪ পৃষ্ঠা, ১ম সংস্করণ।

৯. দৈনিক আজাদ, ৭ ডিসেম্বর ১৯৬৪ইং।

১০. মুক্তিযুদ্ধের দলীল, ১ম খণ্ড ২৪৪-২৪৫ পৃষ্ঠা, ১ম সংস্করণ।

১১. দৈনিক আজাদ, ১৫ ডিসেম্বর, ১৯৬৪ইং।

১২. মুক্তিযুদ্ধের দলীল, ১ম সংস্করণ ২য় খণ্ড, পৃষ্ঠা ২৪৫।

ইসলামী আইন ও বিচার
জানুয়ারী-মার্চ ২০০৭
বর্ষ ৩, সংখ্যা ৯, পৃষ্ঠা : ৫২-৬৮

ইসলামী দণ্ডবিধি

ড. আব্দুল আযীয আমের

। নয় ।

হত্যার চেয়ে নিম্নপর্যায়ের দৈহিক ক্ষতিসাধনের বিধান

ইতোপূর্বে আমরা বিভিন্ন পর্যায়ের হত্যাকাণ্ড সম্পর্কিত অপরাধের আলোচনা করেছি। এখন আলোচনা করবো যেসব অপরাধে হত্যাকাণ্ড না ঘটে। ফকীহদের দৃষ্টিতে হত্যাকাণ্ডের চেয়ে নিম্ন পর্যায়ের অপরাধ চার প্রকার :

১. শরীরের কোন অঙ্গকে কেটে ফেলা কিংবা যা এর পর্যায়ভুক্ত।

২. কোন অঙ্গের বাহ্যিক আকৃতি বহাল থাকলেও তার কার্যকারিতা বিনষ্ট হয়ে যাওয়া।

৩. মাথায় জখম করা। Skull Fracture.

৪. আহত করা।

উল্লেখিত চার প্রকারের মধ্যে প্রথম দু'প্রকারের অপরাধ যেহেতু প্রকৃতপক্ষে একই প্রকৃতির সেহেতু এ দুটিকে আমরা একই সাথে আলোচনা করবো আর বাকি দুটির আলোচনা হবে ভিন্ন ভিন্ন। কেননা কোন অঙ্গ কেটে ফেলে দেয়া আর সেটির কার্যকারিতা বিনষ্ট হয়ে যাওয়ার মধ্যে তাৎপর্যগত তেমন কোন পার্থক্য নেই।

উল্লেখ্য, ইচ্ছাকৃত অপরাধের বর্ণনায় আমরা সেইসব অবস্থার কথাই বেশি উল্লেখ করেছি যেগুলোতে কিসাস ওয়াজিব হয় না। এসব ক্ষেত্রে বেশীর ভাগ অনিচ্ছাকৃত হত্যাকাণ্ডের অপরাধে যেমন শাস্তি হয় তাই হয়ে থাকে। এক্ষেত্রে আমরা যেসব অপরাধে কিসাস ওয়াজিব হয় না, অথবা যে অপরাধটি সংঘটিত হয়েছে ভুলবশত, সেগুলো একই সাথে আলোচনা করা সমীচীন মনে করছি। তবে বিষয়গুলো সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনায় যাওয়ার আগে হত্যার চেয়ে নিম্ন পর্যায়ের যেসব অপরাধে কিসাস কার্যকর হয় সেগুলোর শর্তাদিও বিস্তারিত আলোচনা করা জরুরী মনে করছি। কারণ এই শর্তগুলো এ ধরনের সকল অপরাধের ক্ষেত্রেই বিদ্যমান থাকা জরুরী।

হত্যাকাণ্ডের চেয়ে নিম্ন পর্যায়ের অপরাধে কিসাস কার্যকর হওয়ার শর্তাদি

হত্যার চেয়ে নিম্ন পর্যায়ের অপরাধে কিসাস কার্যকর হওয়ার ব্যাপারটিও সেইসব শর্তাদির ভিত্তিতেই হয়ে থাকে যে সব শর্তাদি হত্যাকাণ্ডের কিসাসের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য। এজন্য অপরাধ ও

শাস্তির মধ্যে সামঞ্জস্য থাকা জরুরী। অপরাধীকে ততটুকুই শাস্তি দিতে হবে ক্ষতিগ্রস্ত ব্যক্তি যতটুকু ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে। এজন্য হত্যাকাণ্ডের ক্ষেত্রে যেসব শর্তাদি বিদ্যমান থাকা আবশ্যিক, হত্যাকাণ্ডের নিম্নের পর্যায়ের অপরাধেও কিসাস কার্যকর করার ক্ষেত্রে সেসব শর্তাদি বিদ্যমান থাকতে হবে। যেমন অপরাধীকে প্রাপ্ত বয়স্ক, সজ্ঞান, স্বাধীন, এবং ইচ্ছাকৃত অপরাধ কর্ম সম্পাদনকারী হতে হবে এবং ক্ষতিগ্রস্ত ব্যক্তি সার্বিকভাবে নিরপরাধ হতে হবে। সেই সাথে ক্ষতিগ্রস্ত ব্যক্তি অপরাধীর সন্তান হলে কিসাস কার্যকর হবে না। অপরাধ ও ক্ষতির মধ্যে কোন প্রকারের বাধা বিপত্তি থাকবে না। এসব শর্তের ব্যাপারে আমরা এর আগে বিস্তারিত আলোচনা করেছি।[১]

হত্যার অপরাধে কিসাস কার্যকর হয় মৃত্যু সংঘটিত হওয়ার পর। ফলে সেই কিসাস কার্যকর করার দ্বারা অপরাধীর কোন প্রকার ক্ষতি হওয়ার সুযোগ নেই অথবা দণ্ড প্রয়োগে সীমালংঘনেরও অবকাশ নেই, কিন্তু হত্যার চেয়ে নিম্নপর্যায়ের ক্ষয়ক্ষতিতে কিসাস কার্যকর করার বিষয়টি সম্পূর্ণ ভিন্ন। কারণ এক্ষেত্রে শুধু নির্দিষ্ট একটি অঙ্গ কর্তন করা কিংবা নির্দিষ্ট পরিমাণ ক্ষত করার অবকাশ থাকে। অপরাধীকে হত্যার উদ্দেশ্য থাকে না। মানুষের শরীর সব অঙ্গ প্রত্যঙ্গের সম্মিলিত একটি রূপ। নির্দিষ্ট কোন একটি অঙ্গে কিসাস কার্যকর করতে গিয়ে অন্য অঙ্গের ক্ষতি হয়ে যাওয়ার সম্ভাবনা থাকে, অনেক ক্ষেত্রে অপরাধীর মৃত্যুও হতে পারে অথচ এক্ষেত্রে অপরাধীর মৃত্যু কখনোই কাম্য নয়। বস্তুত এ ধরনের কিসাসের ক্ষেত্রে জরুরি হলো, অপরাধীকে যতটুকু প্রাপ্য এর বেশি শাস্তি দেয়া যাবে না। এটা নিশ্চিত করতে হবে কিসাস বাস্তবায়ন করতে গিয়ে যেনো অপরাধীর উপর জুলুম না করা হয়। এমনটিও নিশ্চিত করতে হবে, যে অপরাধ সে করেনি, এমন শাস্তি তাকে দেয়া হয়নি। তাছাড়া এ বিষয়টিও নিশ্চিত করতে হবে অপরাধীকে শাস্তি দিতে গিয়ে যেন উল্টো কিসাসযোগ্য অপরাধের উদ্ভব না হয়ে যায়। এজন্য হত্যার চেয়ে নিম্নপর্যারে কিসাসের ক্ষেত্রে ফকীহগণ কয়েকটি শর্তের উল্লেখ করেছেন। এসব শর্তের মধ্যে প্রধান শর্ত হলো, অপরাধ ও শাস্তির মধ্যে সাযুজ্য থাকতে হবে অর্থাৎ অপরাধীর দ্বারা যতটুকু ক্ষতি হয়েছে ঠিক ততটুকু শাস্তিই অপরাধীকে দেয়ার অবকাশ থাকতে হবে।

১. অপরাধ ও শাস্তির মধ্যে সাযুজ্য ও সামঞ্জস্য থাকার অর্থ হলো, অপরাধ সংঘটনের দ্বারা যতটুকু ক্ষতি হয়েছে শাস্তি প্রয়োগের দ্বারা ঠিক ততটুকুই ক্ষতি করা হবে। কারণ শরীরের বিভিন্ন অঙ্গ প্রত্যঙ্গের অবস্থান ও কার্যকারিতা ভিন্ন ভিন্ন। তাই নাকের পরিবর্তে কখনো চোখ কিসাস নেয়া যাবে না। ঠিক ডানের অঙ্গের পরিবর্তে বামের অঙ্গের কিসাস নেয়া যাবে না। তদ্রূপ উপরের দাঁতের বদলে উপরের দাঁতই কিসাস স্বরূপ ভাঙতে হবে নীচের দাঁত ভাঙা যাবে না।

২. পূর্ণ সাযুজ্য বা সামঞ্জস্য থাকার অর্থ হলো, অপরাধীকে তার অপরাধের বিপরীতে পরিপূর্ণ ক্ষতিসাধন সম্ভব হওয়া। এমনটি তখনই সম্ভব যখন কোন অঙ্গকে নির্দিষ্ট পরিমাণ কর্তন করা হবে। উপরে বর্ণিত দুটি শর্ত কঠোরভাবে প্রয়োগ করা হলে কোন ধরনের জুলুম বা সীমা লঙ্ঘনের অবকাশ থাকবে না। সেই সাথে মহান আল্লাহর নির্দেশের পূর্ণ বাস্তবায়নও সম্ভব হবে। মহান

আল্লাহ বলেন, 'আমি তাতে তাদের জন্যে বিধান দিয়েছিলাম প্রাণের বদলে প্রাণ, চোখের বদলে চোখ, নাকের বদলে নাক, কানের বদলে কান, দাঁতের বদলে দাঁত এবং যখমের বদলে অনুরূপ যখম।' ক্ষতি ও শাস্তি প্রয়োগের মধ্যে যদি সাযুজ্য না থাকে, অথবা অপরাধের মাত্রা অনুযায়ী পূর্ণ শাস্তি প্রয়োগের সুযোগ না থাকে, তাহলে কিসাস রহিত হয়ে যাবে।[২] এ ব্যাপারে সামনে আমরা বিস্তারিত আলোচনা করবো।

কিসাসের বিভিন্ন প্রাসঙ্গিক বিষয়ে ফকীহগণের মধ্যে মতপার্থক্য আছে কিন্তু কিসাস প্রয়োগের জরুরী শর্তগুলোর ব্যাপারে কোন মতপার্থক্য নেই। যেমন কেউ বলেন, জিহবা কাটার অপরাধে কিসাস প্রয়োগ হবে। আবার কেউ বলেন, জিহবা কাটার অপরাধে কিসাস প্রয়োগ করা হবে না। জিহবা কাটার অপরাধে কিসাস প্রয়োগের সমর্থকদের যুক্তি হলো, যেসব অঙ্গের জোড়া আছে এবং জোড়ায় কেটে ফেললে তাতে দেহের অন্য কোন অঙ্গ ক্ষতিগ্রস্ত হয় না জিহবাও অনুরূপ। জিহবার একটি মজবুত গোড়া আছে যা জোড়ার মতোই। তাই অপরাধী যে পরিমাণ জিহবা কেটেছে তার উপর ঠিক এই পরিমাণ জিহবা কাটার কিসাস প্রয়োগ করা যাবে। যারা জিহবা কর্তনের অপরাধে কিসাসের বিপক্ষে তাদের যুক্তি হলো, জিহবা একটি সংকোচন ও সম্প্রসারণশীল অঙ্গ ফলে অপরাধী যতটুকু জিহবা কেটেছে ঠিক ততটুকু জিহবা কর্তনের বিষয়টি নিশ্চিত করা অসম্ভব।

এখানে লক্ষণীয় বিষয় হলো, উল্লেখিত বিষয়ে উভয় পক্ষ একমত, যে ক্ষেত্রে পূর্ণ কিসাস নেয়ার অবকাশ আছে তাতে কিসাস প্রয়োগ হবে। এই শর্তের আবশ্যকতা নিয়ে তাদের মধ্যে কোন মতানৈক্য নেই। মতানৈক্য সৃষ্টি হয়েছে, জিহবার মধ্যে এই শর্ত বিদ্যমান কি-না এ ব্যাপারে। অন্যান্য যেসব অঙ্গের কিসাসের ব্যাপারে ফকীহগণের মধ্যে মতবিরোধ রয়েছে সেগুলোও অনুরূপ।

একটি অঙ্গ কর্তনের অপরাধে কি একাধিক অপরাধীর অঙ্গ কর্তন করা যাবে?

হত্যার চেয়ে নিম্নের নির্দিষ্ট অপরাধে যদি অপরাধী একাধিক হয় তাহলে সবার উপরই কি কিসাসের শাস্তি প্রযোজ্য হবে? এ ব্যাপারে ফকীহদের মধ্যে মতভিন্নতা রয়েছে। কোন কোন ফকীহ এক্ষেত্রে হত্যা ও হত্যার চেয়ে নিম্নের অপরাধের মধ্যে পার্থক্য করেছেন।

জাহেরী মতাবলম্বীগণ বলেন, একটি হাত কর্তনের অপরাধে অপরাধী একাধিক হলে তাদের সবার হাতকাটা যাবে না। ইমাম শাফেয়ী ও ইমাম মালেক রহ. বলেন, একটি হাত কর্তনের অপরাধে একাধিক হাত কর্তন করা যাবে। তাদের মতে একটি প্রাণ নাশের অপরাধে একাধিক অপরাধীকে মৃত্যুদণ্ডে দণ্ডিত করা যায়। কিন্তু হানাফী ফকীহগণ, হত্যার চেয়ে নিম্ন পর্যায়ের অপরাধ ও হত্যার দণ্ডের মধ্যে পার্থক্য করেছেন। হানাফীগণ বলেন, একটি প্রাণ নাশের অপরাধে কিসাস স্বরূপ একাধিক অপরাধী মৃত্যুদণ্ডে দণ্ডিত হলেও হত্যার চেয়ে নিম্ন পর্যায়ের অপরাধে একটি হাত কর্তনের অপরাধে জড়িত একাধিক অপরাধীর হাত কর্তন করা যাবে না।

যারা হত্যার চেয়ে নিম্নপর্যায়ের কিসাস প্রয়োগের ক্ষেত্রে অপরাধী একাধিক হলে কিসাস প্রয়োগের বিপক্ষে তাদের দলীল হলো :

১. হত্যার চেয়ে নিম্ন পর্যায়ের অপরাধে কিসাস প্রয়োগের জন্য অপরাধ ও শাস্তির মধ্যে সাযুজ্য বিদ্যমান থাকা আবশ্যিক। অথচ এক হাতের মোকাবেলায় একাধিক হাত কর্তনের মধ্যে কোন সাযুজ্য নেই। কেননা দুই বা ততোধিক হাতের সাথে এক হাতের কোন সামঞ্জস্য হতে পারে না। এটাও তো মনে করা যেতে পারে উভয় অপরাধী হাতের একই অংশ কর্তন করেছে। কারণ একটি হাতকে কয়েকটি অংশে ভাগ করা যায়। কিন্তু হত্যার বিষয়টি এর চেয়ে সম্পূর্ণ ভিন্ন। কেননা শরীর থেকে প্রাণ বায়ু বের হয়ে যাওয়াকে কোন ভাগে বিভক্ত করা যায় না। এমতাবস্থায় হাতের কোন অংশ কাটার অপরাধে কারো গোটা হাত কেটে ফেলা সাদৃশ্যের পরিপন্থী। অথচ কিসাসের মধ্যে সাদৃশ্য হওয়া কিংবা সামঞ্জস্য থাকা শরীয়তের দৃষ্টিতে শর্ত। এ মর্মে মহান আল্লাহ নির্দেশ দিয়েছেন, আমি তাদের জন্য বিধান দিয়েছি, প্রাণের বদলে প্রাণ, চোখের বদলে চোখ, নাকের বদলে নাক, কানের বদলে কান, দাঁতের বদলে দাঁত এবং যখমের বদলে যখম কিসাস হিসেবে সমান সমান প্রতিদানের।

২. হত্যার চেয়ে নিম্ন পর্যায়ের অপরাধকে হত্যার মতো গুরুতর অপরাধের সাথে তুলনা করা যাবে না। কেননা কাউকে হত্যার ক্ষেত্রে হত্যাকারী ও নিহতের মধ্যে ব্যক্তিত্বের সমতা ধর্তব্য নয়। কেননা হত্যাকাণ্ডের অপরাধে সুস্থ মানুষের বিপরীতে সুস্থ মানুষকেই মৃত্যুদণ্ড দেয়া হয়।

৩. হত্যাকাণ্ডের মতো অপরাধে সাধারণত একাধিক অপরাধী জড়িত থাকে কিন্তু হত্যার চেয়ে নিম্নপর্যায়ের অপরাধে অপরাধীর সংখ্যা সাধারণত কমই থাকে। বস্তুত এই দুই অবস্থার মধ্যে ভিন্নতা আবশ্যিক ব্যাপার।

৪. হত্যার চেয়ে নিম্ন পর্যায়ের অপরাধের কিসাস সম্পদের ক্ষয়ক্ষতির পর্যায়ভুক্ত। সম্পদের ক্ষয়ক্ষতিতে যেমন সমতা রক্ষা করা আবশ্যিক এক্ষেত্রেও সমতা রক্ষা করা জরুরী।

যেসব ফকীহ হত্যার চেয়ে নিম্ন পর্যায়ের অপরাধের কিসাসে অপরাধী একাধিক হওয়ার ক্ষেত্রে একের বিপরীতে একাধিক অঙ্গ কর্তনের পক্ষে তাদের দলীল হলো,

১. হযরত আলী রা. থেকে বর্ণিত। তাঁর কাছে দু'জন লোক এক ব্যক্তির বিরুদ্ধে চুরির সাক্ষ্য দিল। দু'জনের সাক্ষ্য পেয়ে তিনি অভিযুক্ত ব্যক্তির হাত কর্তনের নির্দেশ দিলেন। অতঃপর সাক্ষ্যদাতা দু'জন তাঁকে জানালো, আমরা মিথ্যা সাক্ষ্য দিয়েছিলাম, আসলে এই ব্যক্তি চোর নয়, চোর অন্য ব্যক্তি। তখন হযরত আলী রা. দ্বিতীয় ব্যক্তির বিরুদ্ধে দেয়া তাদের সাক্ষ্য বাতিল করে দিয়ে প্রথম ব্যক্তির বিরুদ্ধে তাদের মিথ্যা সাক্ষ্যের কারণে মিথ্যা সাক্ষ্যদাতাদের উপর জরিমানা আরোপ করেন এবং বলেন, 'আমি যদি জানতাম, তোমরা জেনে বুঝে একজন নিরপরাধ ব্যক্তির বিরুদ্ধে মিথ্যা সাক্ষ্য দিচ্ছো, তাহলে আমি তোমাদের উভয়ের হাত কর্তনের নির্দেশ দিতাম।' উপরের উক্তি থেকে বুঝা যায়, হযরত আলী রা. একটি হাত কর্তনের বিপরীতে একাধিক হাত কর্তনের সমর্থক ছিলেন।

২. কিসাসযোগ্য অপরাধ দু'প্রকার : এক. হত্যা, দুই. হত্যার চেয়ে নিম্ন পর্যায়ের অপরাধ। হত্যাকাণ্ডের কিসাস প্রয়োগে যদি একটি প্রাণের বিপরীতে একাধিক ব্যক্তিকে মৃত্যুদণ্ডে দণ্ডিত করা

যায় তাহলে হত্যাকাণ্ডের চেয়ে নিম্ন পর্যায়ের অপরাধের কিসাসেও এক ব্যক্তির বিরুদ্ধে কৃত অপরাধে একাধিক ব্যক্তির উপর দণ্ড প্রয়োগ করা যাবে।[৩]

গ্রন্থকার বলেন, আমার মতে হত্যার অপরাধ ও হত্যার চেয়ে নিম্ন পর্যায়ের অপরাধে একই উপাদান যুক্ত। তাই উভয় ক্ষেত্রে একজন ক্ষতিগ্রস্ত ব্যক্তির বিপরীতে জড়িত একাধিক অপরাধীকে শাস্তি ভোগ করতে হবে। প্রথমত এই মতের পক্ষাবলম্বনকারীদের দলীল রয়েছে। দ্বিতীয়ত জীবনের বিপরীতে শরীরের অন্যান্য অঙ্গ প্রত্যঙ্গ সম্পদের মতো নয়। বস্তুত অঙ্গ প্রত্যঙ্গের ক্ষয়ক্ষতি সম্পদের ক্ষয়ক্ষতির সাথে তুলনীয় হতে পারে না। কেননা শরীরের অঙ্গ প্রত্যঙ্গ শরীরের অংশ। এছাড়া এক্ষেত্রে মনে রাখতে হবে অঙ্গ প্রত্যঙ্গকে সম্পদের সাথে তুলনা করলে অপরাধী একের অধিক হওয়ার ক্ষেত্রে শাস্তি থেকে রেহাই পেয়ে যাবে। কেননা একাধিক অপরাধী হলে সেক্ষেত্রে তাদের পক্ষে কঠোর শাস্তিকে লঘু শাস্তিতে রূপান্তরের অবকাশ সৃষ্টি হবে। হত্যাকাণ্ডের অপরাধে অধিকাংশ ক্ষেত্রেই এমনটি হয়ে থাকে।

এই বেঁচে যাওয়ার ব্যাপারটি ঘটে তখন যখন অপরাধী একাধিক থাকে এবং আলাদা আলাদা ভাবে প্রত্যেকের অপরাধকে চিহ্নিত করার সুযোগ না থাকে। এবং তাদের প্রত্যেকেই একবার একই সাথে অপরাধে সংশ্লিষ্ট হয়ে থাকে। যদি এমন জটিলতা না থাকে, প্রত্যেকের অপরাধকে আলাদাভাবে চিহ্নিত করা যায়, তাহলে প্রত্যেকের অপরাধের মাত্রা অনুপাতে শাস্তি দেয়া হবে।

কোন অঙ্গহানি ঘটানো কিংবা বিকলাঙ্গ করার শাস্তি

যেসব অপরাধে ক্ষতিগ্রস্ত ব্যক্তির কোন অঙ্গ কাটা পড়ে অথবা কোন অঙ্গ সম্পূর্ণ বিকল হয়ে যায় এবং কার্যকারিতার বিলোপ ঘটে এসব অপরাধ দুই প্রকার।

এক. কখনো অপরাধ ইচ্ছাকৃতভাবে সংঘটিত হয়।

দুই. কখনো ভুলবশত এমনটি ঘটে যায়।

হত্যার চেয়ে নিম্ন পর্যায়ের অপরাধে ইচ্ছাসদৃশ বা ইচছাকৃত অপরাধের সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ বলে কোন পর্যায় আছে কিনা এ ব্যাপারে ফকীহদের মধ্যে মতভিন্নতা রয়েছে। এ ব্যাপারে ফকীহদের মতভিন্নতা আগে আলোচনা করে পরে অঙ্গহানি কিংবা অঙ্গ বিকলের অপরাধে কিসাস প্রয়োগের শর্তাদির বর্ণনা করাটাই হবে সমীচীন। যেসব শর্ত কিসাস প্রয়োগের ক্ষেত্রে বিদ্যমান থাকা জরুরী এবং যেসব শর্তের অবর্তমানে কিসাস বাতিল হয়ে যায় এগুলো আলোচনার পর সেইসব অপরাধের শাস্তি সম্পর্কে আলোচনা করবো যেসব অপরাধ অনিচ্ছাকৃত ভুলে কিংবা ইচ্ছাকৃতভাবে করলেও তাতে কিসাস কার্যকরী হয় না।

উল্লেখিত অপরাধে ইচ্ছাকৃত অপরাধের সাথে সাদৃশ্যপূর্ণ কোন পর্যায় আছে না নেই[৪]

যেসব অপরাধে ক্ষতিগ্রস্ত ব্যক্তির কোন অঙ্গহানি ঘটে কিংবা কোন অঙ্গের সম্পূর্ণ কার্যকারিতা বিনষ্ট হয়ে যায়, তাতে ইচ্ছাকৃত অপরাধের সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ কোন পর্যায় আছে কি নেই, এ ব্যাপারে

ফকীহদের মধ্যে মতভিন্নতা রয়েছে। একপক্ষ বলেন, ইচ্ছাকৃত অপরাধের সাথে এর সামঞ্জস্য রয়েছে, আর একপক্ষ বলেন নেই।

অন্যায়ভাবে আহত হওয়া ক্ষতিগ্রস্ত ব্যক্তির যদি কোন অঙ্গ কেটে ফেলতে হয় অথবা অঙ্গের অবয়ব ঠিক থাকলেও এর কার্যকারিতা বিনষ্ট হয়ে যায় এবং এমন সংক্ষুব্ধ অবস্থায় অপরাধ সংঘটিত হয়েছে যে, এ ধরনের সংক্ষুব্ধ আঘাতে সাধারণত ক্ষত সৃষ্টি হয়ে থাকে। অপরাধী যদি এক্ষেত্রে হত্যার উদ্দেশ্যে আঘাত করে থাকে তাহলে এই অপরাধ সকল ফকীহদের মতেই ইচ্ছাকৃত অপরাধ হিসেবে গণ্য হবে।

মতভিন্নতা মূলত এমন অপরাধের ক্ষেত্রে যাতে এমন অস্ত্র ব্যবহার করা হয়েছে যা সাধারণত ক্ষত সৃষ্টি করে না। যেমন থাপ্পড় কিংবা চাবুকের আঘাত। অথবা বিষয়টি যদি এমন হয় অপরাধীর সাথে ঠাট্টাচ্ছলে, অথবা খেলাচ্ছলে কিংবা শিক্ষামূলক শাস্তি দিতে গিয়ে এমনটি ঘটে গেছে। যেমন, এক লোক কাউকে থাপ্পড় মারল আর তাতে লোকটির চোখ ফেটে গেল।

জমহুরে ফুকাহার অভিমত হলো, উল্লেখিত অবস্থায় কৃত অপরাধ ইচ্ছাকৃত অপরাধ সদৃশ বলে গণ্য হবে। এবং কিসাস কার্যকর হবে না। কিসাসের পরিবর্তে এমন অপরাধে কঠোর দিয়্যত (hard blood money) সাব্যস্ত হবে। ইরাকী ফকীহগণ ইমাম মালেক র. এর এমন অভিমত সংকলন করেছেন। তবে এমন অপরাধের বেলায় ইমাম মালেক র. এর বহুল আলোচিত মত হলো, উল্লেখিত অপরাধ যদি পিতাকর্তৃক পুত্রের বিরুদ্ধে ঘটে থাকে তাহলে তাকে ইচ্ছাকৃত সদৃশ বলা হবে। তবে অন্যদের ক্ষেত্রে তা ইচ্ছাকৃত অপরাধ হিসেবে গণ্য হবে।

ইমাম আবু হানিফা র. ইমাম আবু ইউসুফ র. এবং ইমাম মুহাম্মদ র. এর মত হলো, হত্যার চেয়ে নিম্ন পর্যায়ের অপরাধে ইচ্ছাকৃত সদৃশ বলে কোন অপরাধের পর্যায় নেই। শুধু হত্যাকাণ্ডের ক্ষেত্রেই এমন পর্যায় হতে পারে।[৫]

যেসব ইচ্ছাকৃত অপরাধে কিসাস হয় না

উপরে আমরা আলোচনা করেছি হত্যার চেয়ে নিম্ন পর্যায়ের ইচ্ছাকৃত অপরাধে কিসাস ওয়াজিব হয়। তদ্রূপ অপরাধী যদি ইচ্ছাকৃত এমন কার্য করে যার দ্বারা ক্ষতিগ্রস্ত ব্যক্তির কোন অঙ্গ কেটে যায় কিংবা কোন অঙ্গের অবয়ব বহাল থাকলেও এর কার্যকারিতা বিনষ্ট হয়ে যায় তবে অপরাধীর বিরুদ্ধে কিসাস কার্যকরী হবে এবং অপরাধীকে অতটুকু ক্ষতি করা যাবে তার আঘাতে যতটুকু ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে আঘাতপ্রাপ্ত ব্যক্তি।

উল্লেখিত বিধানটি যথার্থ তবে এক্ষেত্রে কিসাস কার্যকরী করার জন্যে কিছু শর্ত রয়েছে। কিসাস বাস্তবায়নে এসব শর্ত বিদ্যমান থাকা জরুরী। এসব শর্তাদির কোন একটি শর্ত না পাওয়া গেলে কিসাস কার্যকরী হবে না। শর্তগুলোর মধ্যে প্রধানতম শর্ত হলো, অপরাধী ও ক্ষতিগ্রস্ত ব্যক্তির অঙ্গের মধ্যে সাদৃশ্য থাকা এবং অপরাধীর আঘাতে আঘাত প্রাপ্ত ব্যক্তির যে পরিমাণ ক্ষতি হয়েছে অপরাধীরও ততটুকু ক্ষতি করার অবকাশ থাকা। উল্লেখিত দু'টি শর্ত ভিন্ন ভিন্ন উদাহরণসহ বিশদ

বর্ণনার অবকাশ রাখে। যাতে কোন কোন অবস্থায় এসব শর্ত পাওয়া যায় না এবং কোন অবস্থার প্রেক্ষিতে উল্লেখিত অপরাধের কিসাস অকার্যকর সাব্যস্ত হয় তা নির্ণয় করা সম্ভব হয়।

সাদৃশ্য না থাকা

হত্যার চেয়ে নিম্ন পর্যায়ের অপরাধে অপরাধীর উপর শাস্তিস্বরূপ কিসাস বাস্তবায়নে উভয়ের অঙ্গের মধ্যে সাদৃশ্য থাকা প্রধান শর্ত। সাদৃশ্য না থাকলে কিসাস কার্যকরী হবে না। যেমন অপরাধী যদি ক্ষতিগ্রস্ত ব্যক্তির কোন অঙ্গ কেটে ফেলে অথবা অপরাধীর আঘাতে কোন অঙ্গের কার্যকারিতা সম্পূর্ণ বিনষ্ট হয়ে যায়। কিন্তু যদি এমন হয় যে অপরাধীর দেহে সেই অঙ্গটি নেই। ধরুন কোন অন্যায় আঘাতের কারণে কারো বাম হাত কাটতে হয়েছে বা কাটা পড়েছে, এমতাবস্থায় যদি অপরাধীর দেহের বাম হাত পূর্ব থেকেই কর্তিত থাকে। বিচারক অপরাধীর ডান হাত কর্তনের নির্দেশ দিতে পারবেন না। কেননা বাম হাত ডান হাতের সাথে কোনই সাদৃশ্য রাখে না। অবস্থানগত দিক থেকেও বাম হাত ডান হাতের সাথে সাদৃশ্যপূর্ণ নয় এবং কার্যকারিতা ও উপকার বিবেচনায়ও বাম হাতের সাথে ডান হাতের সমকক্ষতা নেই। এক্ষেত্রেও যদি কিসাসের বিধান কার্যকর করা হয়, তা হবে অপরাধীর উপর এটা হবে একটা মারাত্মক জুলুম। তদ্রূপ যেসব ক্ষেত্রে এ ধরনের সাদৃশ্য না পাওয়া যাবে সেসব ক্ষেত্রে কিসাস কার্যকরী হবে না। অনুরূপ সেই ক্ষেত্রেও কিসাস কার্যকরী হবে না অপরাধীর আঘাতে ক্ষতিগ্রস্তের যে অঙ্গ বিনষ্ট হয়েছে বা কাটা পড়েছে যদি অপরাধীর দেহে সেই অঙ্গ মোটেই না থাকে।

একই বিধান হবে অপরাধ যদি এমন কোন অতিরিক্ত অঙ্গের উপর ঘটে যা সৃষ্টিগতভাবেই শরীরে অতিরিক্ত হিসেবে গণ্য। যেমন ষষ্ঠ আঙ্গুল। তাতেও কিসাস কার্যকরী হবে না। কেননা একটি অতিরিক্ত অঙ্গ মূল অঙ্গের সমকক্ষ হতে পারে না। এর বিপরীতে অপরাধী যদি মূল আঙ্গুল কেটে থাকে এর শাস্তি স্বরূপ অতিরিক্ত আঙ্গুল কাটলে হবে না, মূল আঙ্গুলই কাটতে হবে। বস্তুত একটি অতিরিক্ত অঙ্গের কিসাস স্বরূপ একটি অতিরিক্ত অঙ্গ তখনই কাটা হবে যখন উভয় অতিরিক্ত অঙ্গের অবস্থান ও গঠনের মধ্যে পূর্ণমাত্রায় সাদৃশ্য পাওয়া যাবে। কোন দিক থেকে যদি এই অতিরিক্ত উভয় অঙ্গের মধ্যে সমতা ও সাদৃশ্য না থাকে তাহলে কিসাস কার্যকরী হবে না।

অপরাধী এবং ক্ষতিগ্রস্ত ব্যক্তি যদি আপসে এ ব্যাপারে সমঝোতা করে নেয় যে, কর্তিত অঙ্গের কিসাস স্বরূপ এমন কোন অঙ্গ কাটা হবে কর্তিত অঙ্গের সাথে যার অবস্থান অবয়ব ও উপকারিতা কোন দিক থেকেই সামঞ্জস্য নেই। তাহলে তাদের এই আপসরফা বা সমঝোতা শরীয়তের দৃষ্টিতে গ্রহণযোগ্য হবে না। কেননা এসব অপরাধ এমন যেগুলো ক্ষতিগ্রস্তের সম্মতি কিংবা সমঝোতাকে গ্রাহ্য করে না। কারণ কোন মানুষের এই অধিকার নেই যে, সে ইচ্ছা করলেই আত্মহত্যা করে ফেলবে। অথবা নিজের কোন অঙ্গকে ক্ষতিগ্রস্ত করবে। কাজেই কেউ যদি অনুমতি দেয় তাতে অন্য কেউ তার শরীরের কোন অংশের ক্ষতি করার বৈধতা পেয়ে যায় না। এসব অপরাধ আল্লাহর অধিকারের বিরুদ্ধাচরণমূলক অপরাধ। কেননা মহান আল্লাহ মানুষের জীবনকে খুবই সম্মানিত

করেছেন এবং এর নিরাপত্তাকে আবশ্যিক করেছেন। বস্তুত হক্কুল্লাহর ক্ষেত্রে আল্লাহর বিধানই কার্যকরী হবে।

ক্ষতিগ্রস্ত অঙ্গের যদি কার্যকারিতা বিনষ্ট হয়ে যায় কিংবা অনুভূতিহীন হয়ে পড়ে তাহলে এর পরিবর্তে কোন সুস্থ অঙ্গ কর্তন করা যাবে না। যেসব অঙ্গে সাদৃশ্য না থাকে সব অঙ্গের ব্যাপারে একই বিধান। যেমন ক্ষতিগ্রস্ত অঙ্গের আঙুল যদি অসম্পূর্ণ থেকে থাকে তবে সেই হাতের বিপরীতে সুস্থ স্বাভাবিক আঙ্গুল সম্পন্ন হাত কর্তন করা যাবে না।[৬]

যেক্ষেত্রে অপরাধের মাত্রা অনুযায়ী শাস্তি দেয়া সম্ভব নয়

অঙ্গ যদি জোড়ায় না কাটে এবং কর্তিত অংশ যদি সেই পরিমাণ না হয় যা দ্বারা অঙ্গের কার্যকারিতা বিনষ্ট হয়ে যায় এক্ষেত্রেও অপরাধীর উপর কিসাস কার্যকরী হবে না। কেননা কিসাসের ক্ষেত্রে অপরাধী যতটুকু ক্ষতি করেছে ঠিক তার ততটুকু ক্ষতি করার বিধান রয়েছে। এক্ষেত্রে কোন অঙ্গ জোড়ায় কর্তিত হওয়ায় কিংবা এমন জায়গায় কর্তিত হওয়া আবশ্যক যেখানে সাধারণত কাটার প্রচলন রয়েছে। কারণ এমন কিছু অঙ্গ আছে, অপরাধের বিপরীতে অপরাধীর যদি ঠিক ততটুকু অঙ্গ কাটা হয় তাহলে যতটুকু ক্ষতি সে করেছে ঠিক ততটুকু ক্ষতি করা সম্ভব নাও হতে পারে। যেমন, নাকের হাড় (Nasal Bone) হাতের তালু, হাতের নিম্নাংশ, (Lower Arm) অর্ধেক পা, হাতের উর্ধাংশ (Upper Arm) অথবা নিতম্ব। এগুলোতে কিসাস নেই। নবী করীম স. এর সময় এক ব্যক্তি তরবারী দিয়ে অপর একজনের হাতে আঘাত করলে জোড়া থেকে দূরে হাত কেটে যায়। রসূল স. তার কাছ থেকে দিয়্যত আদায় করেন। ক্ষতিগ্রস্ত লোকটি বারবার বলছিল সে এই অপরাধের কিসাস নিতে চায়। কিন্তু রসূল স. তাকে বললেন, 'দিয়্যত নাও, তাতেই তোমাকে আল্লাহ তাআলা বরকত দেবেন।' এক্ষেত্রে একথা মনে রাখতে হবে, এ ধরনের ঘটনায় কিসাস কার্যকরী করলে তাতে যথাযথভাবে শাস্তি প্রয়োগ অত্যন্ত কঠিন বরং তা জুলুমের পর্যায়ে চলে যাওয়ার আশংকাই বেশি। হ্যাঁ, যদি কিসাস কার্যকরী করার সুযোগ থাকে এবং ক্ষতিগ্রস্তের অঙ্গের হুবহু অংশ কাটা সম্ভব হয় তাহলে কিসাস কার্যকরী হবে।[৭]

প্রশ্ন হতে পারে, পরিপূর্ণ কিসাস যদি কার্যকর করা না যায়, তবে যতটুকু অঙ্গে কিসাস কার্যকর করা সম্ভব অর্থাৎ তার চেয়ে কম পরিমাণ অঙ্গে কি কিসাস কার্যকরী করা যাবে? যেমন কারো আঘাতে যদি নাকের হাড় এবং নাকের উপরের গোশত কেটে যায় তাহলে শুধু নাকের উর্ধাংশের গোশতের বিনিময়ে কি কিসাস নেয়া যাবে? অথবা হাতের উর্ধাংশ কেটে গেলে কুনুই পর্যন্ত কেটে কি কিসাস নেয়া যাবে? ইমাম শাফেয়ী ও ইমাম আহমদ ইবনে হাম্বল র. এর কতিপয় অনুসারী এভাবে কিসাস কার্যকরী করার পক্ষে। কারণ এ ক্ষেত্রে কিসাসের দাবিদার পূর্ণ কিসাস কার্যকরী করতে পারবে না।

অতএব তার প্রাপ্যের চেয়ে কিছুটা ঘাটতিতেই তাকে সম্মত হতে হবে। তাঁদের দৃষ্টিতে চেহারা ও মাথার আঘাতের ক্ষেত্রেও অনুরূপ বিধান কার্যকরী হবে। যেমন 'হাশিমার' ক্ষেত্রে মুজিহা প্রয়োগে

কার্যকর করা হয়। অর্থাৎ অপরাধীর আঘাতে যদি মাথার হাড় ফেটে গিয়ে থাকে তাহলে কিসাস স্বরূপ তাকে শুধু এতটুকু আহত করতে পারবে যাতে শুধু গোশত দূরীভূত হয়ে হাড় গোচরীভূত হয়।[৮] এরপরও যতটুকু থাকবে এজন্য ক্ষতিগ্রস্ত ব্যক্তি অপরাধীর কাছ থেকে অনির্দিষ্ট (Unprescribed Damages) জরিমানার হকদার হবে। কারণ অবশিষ্ট ক্ষতির কিসাস নেয়া তার পক্ষে সম্ভব নয়। কোন কোন ফকীহ বলেছেন, অবিশষ্টাংশের জন্য ক্ষতিগ্রস্ত ব্যক্তি কোন জরিমানা পাওয়ার হকদার হবে না। কারণ তাকে যদি এই অধিকার দেয়া হয় তাহলে একই অঙ্গে দুই ধরনের শাস্তি তথা কিসাস ও জরিমানা ধার্যের ঘটনা ঘটবে যা গ্রহণযোগ্য নয়।[৯]

গ্রন্থকার বলেন, আমার মতে উপরোল্লেখিত মতামত বেশি গ্রহণযোগ্য। কেননা কিসাসের ক্ষেত্রে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হলো, কিসাস প্রয়োগের সময় ক্ষতিগ্রস্ত ব্যক্তির যতটুকু ক্ষতি হয়েছে শাস্তি এর চেয়ে বেশি হতে পারবে না। এ শর্ত মেনে নিয়েও যদি পরিপূর্ণ কিসাস প্রয়োগ করা না যায় তবে আংশিক প্রয়োগ করার ক্ষেত্রে কোন বাধা নেই। এমতাবস্থায় যদি বলা হয়, না কিসাস তাতে রহিত হয়ে যাবে, তবে অপরাধীদেরকে আইনের আওতায় ছাড় দেয়ার পথ উন্মুক্ত করা হবে। তখন অপরাধীরা এভাবে মানুষের ক্ষতি করবে যাতে কিসাস প্রয়োগ না করা যায়।

মেরুদণ্ডের হাড় যদি কোন অন্যায় আঘাতে ক্ষতিগ্রস্ত হয় যার ফলে মেরুদণ্ড বেঁকে যায়, তাতে কিসাস প্রয়োগ করা যাবে না। কেননা এক্ষেত্রে হুবহু কিসাস প্রয়োগ করা সম্ভব নয়। এক্ষেত্রেও যদি শাস্তি প্রয়োগ করা হয়, অপরাধী যতটুকু ক্ষতি করেছে তার উপর ঠিক ততটুকুই শাস্তি প্রয়োগ করা হবে এ নিশ্চয়তা দেয়া যাবে না।[১০]

কোন অন্যায় আঘাতে যদি চোখের পাতা ক্ষতিগ্রস্ত হয়, ইমাম মালিক র. ও ইমাম আবু হানিফা র. এবং অন্যদের মতে তাতে কিসাস কার্যকরী হবে না। কারণ চোখের পাতায় শাস্তি প্রয়োগের সময় নির্দিষ্ট সীমারেখার মধ্যে সীমিত রাখা সম্ভব হবে না। তাতে অপরাধের অনুরূপ শাস্তি দেয়া অসম্ভব। কিন্তু ইমাম শাফেয়ী র. ইমাম আহমদ র. ও অন্য ফকীহগণ বলেন, চোখের পাতা ও অনুরূপ আঘাতের ক্ষেত্রে কিসাস কার্যকরী হবে। কেননা এটিও ক্ষত বা জখম। কুরআন কারীমে বলা হয়েছে, 'যখমসমূহের ক্ষেত্রেও কিসাস কার্যকরী হবে'। এটি একটি বিধিবদ্ধ আইন। যেহেতু চোখের পাতার একটি নির্দিষ্ট সীমারেখা আছে, সেক্ষেত্রে এটি জোড়ার সাথে তুলনীয়।[১১] অতএব এটিতে কিসাস কার্যকর করতে হবে।

অন্ডকোষের কিসাসের ক্ষেত্রেও ফকীহদের মধ্যে মতভিন্নতা রয়েছে। অনেকেই অন্ডকোষের কিসাস প্রয়োগের বিপক্ষে। কারণ অন্ডকোষের কোন সীমা নেই যেখানে কিসাসকে সীমাবদ্ধ করা যায়। এ মতামত ইমাম আবু হানিফা র. এর। ইমাম শাফেয়ী র. ও ইমাম হাম্বল র.-এর মতাবলম্বী কোন কোন ফকীহ বলেন, অন্ডকোষে কিসাস প্রয়োগ সম্ভব। তাদের দলীল সেই আয়াত 'যখমের বদলে যখম'। তারা বলেন, অন্ডকোষের একটা সীমারেখা আছে, সেখানে গিয়ে কিসাসকে রোধ করা যায়। তাই কোন প্রকার সীমালঙ্ঘন ছাড়াই এক্ষেত্রে কিসাস প্রয়োগ করা সম্ভব। তদ্রূপ কারো যদি একটি অন্ডকোষ কেউ অন্যায় আঘাতে কেটে ফেলে, অভিজ্ঞ চিকিৎসকগণ যদি মতামত দেন,

অপর অন্ডকোষের কোন ক্ষতি সাধন ছাড়াই অপরাধীর একটি অন্ডকোষ কেটে ফেলা সম্ভব তাহলে কিসাস কার্যকর হবে।[১২]

উপরোক্ত আলোচনা থেকে আমরা বুঝতে পারি, অপরাধের সমপরিমাণ শাস্তি দেয়া হবে কিনা এ ব্যাপারে দু'পক্ষের মধ্যে কোন মতভিন্নতা নেই। মতভিন্নতা মূলত কোন কোন অঙ্গে কিসাস বাস্তবায়ন করার শর্ত পাওয়া না পাওয়ার ব্যাপারে।

কারো হস্তক্ষেপে যদি কোন লোকের চোখ বেরিয়ে আসে অথবা চোখ দেবে যায় অথবা চোখের তারা নষ্ট হয়ে যায়, এক্ষেত্রেও কিসাস কার্যকরী হবে কি হবে না, এ ব্যাপারে ফকীহ্গণের মধ্যে মতপার্থক্য দেখা যায়। এক পক্ষের মত হলো, এ ধরনের অপরাধে কিসাসের বিধান কার্যকর নয়। কারণ নির্দিষ্ট সীমারেখার ভেতরে এসব আঘাতের কিসাস কার্যকরী করা অসম্ভব। কেননা চোখ বের করে ফেলা কিংবা চোখ (Sink Down) দাবিয়ে দেয়ার মধ্যে শাস্তিকে সীমিত রাখার ব্যাপারটি ঝুঁকিপূর্ণ। শাস্তিতে যদি অপরাধীর অপরাধের পরিমাণ সীমিত না রাখা যায় তবে আর শাস্তি ও অপরাধের মধ্যে সমতা থাকে না।

পক্ষান্তরে অপর পক্ষের মত হলো, এতেও কিসাস কার্যকর হবে। কেননা এটিও এক প্রকার যখম। সব ধরনের যখমের মধ্যেই কিসাস কার্যকর হবে। তাঁরা বলেন, চোখ বের হয়ে আসারও একটা নির্দিষ্ট সীমা আছে। ফলে এটিও জোড়া বিশিষ্ট অঙ্গের সাথে তুলনীয়। তাই অপরাধ ও শাস্তির মধ্যে সমতা পাওয়া যায়। যেহেতু সামঞ্জস্য রয়েছে তাই সব নির্দিষ্ট সীমার মধ্যে শাস্তি প্রয়োগ করাও সম্ভব।[১৩]

জিহ্বা ও যৌনাঙ্গ কর্তনের ক্ষেত্রেও একই মতপার্থক্য বিরাজমান। ফকীহদের একটি অংশের মত হলো, জিহ্বা ও যৌনাঙ্গ কর্তনের অপরাধে কিসাস বাস্তবায়ন অসম্ভব। কেননা এই অঙ্গ সংকুচিত ও সম্প্রসারিত হয়। ইমাম আবু হানিফা র. এ মত ব্যক্ত করেন। ইমাম শাফেয়ী ও অন্য ফকীহ্গণ বলেন, এগুলোতেও কিসাস ওয়াজিব। কেননা এসব অঙ্গেরও একটা শেষ সীমা আছে। যেখানে গিয়ে শাস্তি রুখে যেতে পারে। এই সীমা জোড়ার সমতুল্য বিবেচিত হবে এবং অপরাধীর উপর কোন প্রকার জুলুম ছাড়াই কিসাস কার্যকরী করা সম্ভব হবে। বস্তুত তাদের দৃষ্টিতে এগুলোও এক প্রকার যখম। আর যে কোন যখমে কিসাস কার্যকর করা ওয়াজিব।

এ পর্যন্ত আমরা মানব দেহের কোন অঙ্গ অন্যায় আঘাতে কাটা পড়ার বিধান সম্পর্কে আলোচনা করেছি। যদি কারো অন্যায় আঘাতে অঙ্গ দৃশ্যত যথাস্থানে বহাল থাকে কিন্তু অঙ্গের উপকারিতাও কার্যক্ষমতা বিনষ্ট হয়ে যায় তাহলে ইমাম আবু হানিফা র. ও অন্যদের মতে এক্ষেত্রে কিসাস প্রয়োগের কোন সুযোগ নেই। কেননা অপরাধীর অপরাধের পরিমাণ করে তদনুযায়ী শাস্তি প্রয়োগ করা অসম্ভব। হ্যাঁ যদি কোন অবস্থায় ক্ষতিগ্রস্ত ব্যক্তির ক্ষতির সমপরিমাণ শাস্তি দেয়া সম্ভব হয় তবে কিসাস কার্যকরী হবে।

যেমন কেউ কাউকে প্রহার করলো। তাতে প্রহৃত লোকটির জ্ঞান লোপ পেলো, অথবা বাকরুদ্ধ হয়ে গেলো কিংবা শ্রবণ বা দৃষ্টিশক্তি হারিয়ে ফেলল, অথবা ঘ্রাণ শক্তি এবং স্বাদ অনুভব শক্তির

মধ্যে ত্রুটি দেখা দিল। উল্লেখিত সবগুলো অবস্থার মধ্যেই অঙ্গ তার যথাস্থানে বহাল রয়েছে বটে কিন্তু কার্যকারিতাও উপকারিতা বিনষ্ট হয়েছে। চিকিৎসা বিজ্ঞানীদের দৃষ্টিতে এক্ষেত্রে শাস্তি স্বরূপ অপরাধীকে অনুরূপ প্রহার করলে অঙ্গের কার্যকারিতা রহিত হবে এবং অঙ্গ দৃশ্যত ঠিক থাকবে তা নিশ্চিত করা আদৌ সম্ভব নয়। এসব ক্ষেত্রেও কিসাস কার্যকর রাখা হবে জুলুম ও সীমালঙ্ঘন। বস্তুত কিসাস প্রয়োগে হ্রাসবৃদ্ধি শরীয়তের আইনে নিষিদ্ধ এবং আল্লাহ তাআলার উদ্দেশ্য পরিপন্থী। হযরত উমর রা. একটি মোকদ্দমায় চার (Damages) দিয়্যতের নির্দেশ দেন। এক ব্যক্তি অপর ব্যক্তিকে প্রহার করলে তার জ্ঞান বোধ, বাকশক্তি দৃষ্টিশক্তি এবং যৌনশক্তি লোপ পায়। উমর রা. অপরাধীর বিরুদ্ধে চার প্রকার দিয়্যতের নির্দেশ জারী করন। এক্ষেত্রে যদি কিসাস কার্যকরী হতো তাহলে হযরত উমর রা. দিয়্যতের হুকুম দিতেন না।[১৪]

উল্লেখিত আশংকা বা ঝুঁকি থাকার পরও যদি পরিপূর্ণ কিসাস নেয়ার মতো অবস্থা থাকে তবে কিসাস কার্যকরী করা ওয়াজিব। যেমন এক লোক অপর একজনকে প্রহার করার কারণে তার দৃষ্টিশক্তি নষ্ট হয়ে গেল। যদি এমন কোন ওষুধ বা চিকিৎসা থাকে যা ব্যবহার করলে অপরাধীর দৃষ্টি শক্তি নষ্ট হয়ে যায় তাহলে এক্ষেত্রে কিসাস প্রয়োগ করতে হবে।[১৫] দৃষ্টি শক্তিতে কিসাস কার্যকরী করার প্রমাণ হযরত উসমান র. এর সময়ের এক ঘটনা। এক গ্রামীণ লোক একটি দুধেল উটনী নিয়ে শহরে আসে। হযরত উসমান রা. এর এক গোলাম গ্রামীণ লোকটির সাথে কেনাবেচার আলোচনা করল। কথাবার্তার একপর্যায়ে গোলাম ও গ্রামীণ লোকটির মধ্যে ঝগড়া বেধে গেল। গোলাম লোকটিকে থাপ্পড় মারলে তার একটি চোখ বেরিয়ে পড়ল। হযরত উসমান লোকটিকে বলেন, 'তুমি যদি সম্মত হও তাহলে আমি তোমাকে দ্বিগুণ দিয়্যত দেবো, তবে কিসাস মাফ করে দিতে হবে।' কিন্তু লোকটি কিসাস মাফ করতে অস্বীকৃতি জানাল। উসমান রা. উভয়কে হযরত আলী রা. এর কাছে সোপর্দ করলেন। হযরত আলী রা. একটি সীসার পাত আনালেন। সেটিকে আগুনে গরম করলেন। অপরাধীর চোখে তূলা লেপ্টে দিলেন। এরপর উত্তপ্ত সীসাদণ্ডকে চিমটা দিয়ে ধরে অপরাধীর চোখের কাছে নেয়ার পর তার চোখের পুতুল গলে গেল।

তাছাড়া চোখে কর্পুর দিলেও চোখের দৃষ্টি শক্তি নষ্ট হয়ে যায়। এক্ষেত্রে চোখের কোটর ক্ষতিগ্রস্ত হওয়ার আশংকা থাকে না। বর্তমানে চোখের দৃষ্টিশক্তি বিনষ্ট করার বহু আধুনিক প্রযুক্তি আবিস্কৃত হয়েছে। অবশ্য একটি চোখে কিসাস প্রয়োগ করতে গিয়ে যদি উভয় চোখের দৃষ্টিশক্তি বিনষ্ট হয়ে যাওয়ার আশংকা হয় তবে কিসাস কার্যকরী করা যাবে না।[১৬]

ইমাম শাফেয়ী র. বলেন, অপরাধী যদি ক্ষতিগ্রস্ত ব্যক্তিকে এমন আঘাত করে যাতে চোখের হাড় দেখা যায়। এর ফলে চোখের মনি বহাল থাকলেও আহত লোকটির দৃষ্টিশক্তি নষ্ট হয়ে যায়। এমতাবস্থায়ও কিসাস ওয়াজিব হবে এবং অপরাধীকে তদ্রূপ যখম করতে হবে। কিসাস প্রয়োগে যদি অপরাধীর চোখের মনি বহাল থাকে এবং দৃষ্টিশক্তিও অক্ষুণ্ন থাকে তবে অন্য কোন ব্যবস্থা গ্রহণের মাধ্যমে দৃষ্টি শক্তি বিলোপ করতে হবে। আর যদি দৃষ্টিশক্তি শাস্তি প্রয়োগের দ্বারাই বিনষ্ট হয়ে যায় তাহলে তো উদ্দেশ্য অর্জন হয়েই গেল। কিসাস প্রয়োগে যদি অপরাধীর চোখের মনি

অক্ষুণ্ন রাখা না যায় তাহলে কিসাস রহিত হয়ে যাবে। কিন্তু অপরাধীর উপর জরিমানা ধার্য হবে। কারো আঘাতেও যদি দৃষ্টি শক্তি রহিত হয়ে যায় তাতেও একই বিধান কার্যকরী হবে।

কারো আঘাতে যদি শ্রবণ শক্তি বিনষ্ট হয়ে যায় তাতেও কিসাস ওয়াজিব হবে। কারণ শ্রবণশক্তিরও একটি নির্দিষ্ট জায়গা আছে। স্বাদ, ঘ্রাণ ও বাকশক্তিও কারো আঘাতে বিনষ্ট হয়ে গেলে কিসাস কার্যকরী হবে। এটিই বিশুদ্ধ মতামত। উপরে দৃষ্টিশক্তি বিনষ্ট হওয়ার বর্ণনায় যেসব দলিল প্রমাণ উল্লেখ করা হয়েছে এক্ষেত্রেও সেগুলোই দলীল। মূলত এসব অঙ্গ নির্দিষ্ট জায়গা নিয়ে গঠিত। অভিজ্ঞ চিকিৎসকগণ অন্য অঙ্গের ক্ষতি সাধন ছাড়াই এগুলোকে নিষ্ক্রীয় ও বেকার করতে সক্ষম। অবশ্য ফকীহদের একটি গ্রুপ মনে করেন, এসব অঙ্গের ক্ষেত্রে কিসাস কার্যকরী হবে না।[১৭]

উল্লেখিত বিষয়গুলোতে হাম্বলী ও শাফেয়ী ফকীহগণ একই অভিমত ব্যক্ত করেন। অবশ্য হাম্বলী মতাবলম্বীগণ থাপ্পড়ের ক্ষেত্রে ভিন্নমত পোষণ করেন। তারা বলেন, কারো থাপ্পড়ের আঘাতে যদি কারো কোন অঙ্গ নষ্ট হয়ে যায় তবে অভিযুক্তকে একটি অনুরূপ থাপ্পড় দেয়া হবে। তাতে যদি তার সেই অঙ্গ বিনষ্ট না হয় তাহলে অন্যকোন প্রক্রিয়ায় অঙ্গের কার্যকারিতা বিনষ্ট করা হবে। তারপরও যদি অপরাধীর সংশ্লিষ্ট অঙ্গ বিনষ্ট করা সম্ভব না হয় তাহলে কিসাস রহিত হয়ে যাবে।

পক্ষান্তরে হাম্বলী মতানুসারী অন্য একটি দলের মতামত হলো, শুধু থাপ্পড় মারাতে কোন কিসাস হয় না, কিসাস মূলত থাপ্পড়ের পরিণতিতে ক্ষতিগ্রস্তের যে অঙ্গহানি ঘটেছে প্রয়োজনে চিকিৎসা পদ্ধতি প্রয়োগ করে অভিযুক্তের সংশ্লিষ্ট অঙ্গ অকার্যকর করে ফেলতে হবে।[১৮]

কোন অন্যায় আঘাতে কারো অঙ্গের অবয়ব অক্ষুণ্ন থাকাবস্থায় এর উপকারিতা ও কার্যকারিতা বিনষ্ট হয়ে যাওয়ার ব্যাপারে ইমাম মালেক, ইমাম শাফেয়ী ও ইমাম আহমদ ইবনে হাম্বল র. একমত পোষণ করেন।[১৯]

যদি কারো অন্যায় আঘাতে কোন অঙ্গ পুরোপুরি নষ্ট হয়ে না থাকে। অঙ্গের কার্যকারিতা বা অবয়ব কিছুটা ক্ষতিগ্রস্ত হয় যেমন কারো অন্যায় আঘাতে আহত ব্যক্তির দৃষ্টিশক্তি হ্রাস পেয়ে থাকে, অথবা আহত ব্যক্তির কানে উচ্চ শব্দ বাজে, তবে তাতে কিসাস ওয়াজিব হবে না। কারণ এই অপরাধে ক্ষতিগ্রস্তের যে পরিমাণ ক্ষতি হয়েছে, অপরাধীর অঙ্গে ঠিক ততটুকু ক্ষতিসাধন করা অসম্ভব ব্যাপার। এমনটি করতে গেলে অপরাধীর অঙ্গের কার্যকারিতা সম্পূর্ণ বিনষ্ট হয়ে যাওয়ার প্রবল ঝুঁকি থাকে, অথবা আহতের ক্ষতির চেয়ে অপরাধীর ক্ষতি বেশি হয়ে যাওয়ার আশংকা থাকে। যা কিসাস আইনের পরিপন্থী। কেননা অপরাধ ও শাস্তির মধ্যে সমতা বিধান না করা হলে তা জুলুম হিসেবে বিবেচিত হবে।[২০]

উপরের দীর্ঘ আলোচনা থেকে আমরা বুঝতে পারলাম কারো অন্যায় হস্তক্ষেপ কিংবা আঘাতে যদি কারো কোন অঙ্গহানি ঘটে কিংবা অঙ্গের কার্যকারিতা বিনষ্ট হয়ে যায় তাতে কিসাস ওয়াজিব হওয়ার ব্যাপারে সকল ফকীহ একমত। অপরাধ ও শাস্তির মধ্যে সমতা বিধান করার ব্যাপারেও সবাই একমত। কিন্তু শাস্তি প্রয়োগের শর্তাদির সমন্বয় ও শাস্তি কার্যকরী করার ব্যাপারে ফকীহগণের মধ্যে মতভিন্নতা দেখা যায়। শাস্তি প্রয়োগের ক্ষেত্রে অনেকেই কঠোরতা অবলম্বন করেছেন। কেউ কেউ কিছুটা নমনীয় মনোভাব প্রকাশ করেছেন।

গ্রন্থপঞ্জি

১. আলবাদায়ে আস্‌সানায়ে, আলকাসানী, খণ্ড ৭, পৃষ্ঠা ২৯৭। তাতে লেখা হয়েছে, তন্মধ্যে এমন শর্তও রয়েছে যা মানুষের জীবনহানি ও এর চেয়ে নিম্ন পর্যায়ের অপরাধকেও অন্তর্ভুক্ত করে। যেমন অপরাধীকে অবশ্যই সজ্ঞান, প্রাপ্ত বয়স্ক, স্বাধীন এবং নিজের উদ্যোগে অপরাধ সংঘটনকারী হওয়া এবং ক্ষতিগ্রস্ত ব্যক্তির সার্বিকভাবে নিরপরাধ ও শাস্তির উর্ধে থাকা। ক্ষতিগ্রস্ত ব্যক্তির অপরাধীর সন্তান কিংবা ক্রয়কৃত গোলাম বা দাসী না হওয়া। এবং সরাসরি অপরাধ সংঘটিত হওয়া। বিদায়াতুল মুজতাহিদ ও নিহায়াতুল মুকতাসিদ, ইবনে রুশদ, খণ্ড-২, পৃষ্ঠা-৩৩৯। আল আহকামুস সুলতানিয়া, আলমাওয়ারদী পৃষ্ঠা ২২১। আল আহকামুস সুলতানিয়া, আবুয়ালা পৃষ্ঠা ২৬০, আলমুগনী, ইবনে কুদামা, খণ্ড ৯, পৃষ্ঠা ৪১৬।

২. আলবাদায়ে, আলকাসানী খণ্ড ৭, পৃষ্ঠা ২৯৭। তাতে লেখা হয়েছে, যেসব অঙ্গের দ্বারা অপরাধ সংঘটিত হয়েছে এবং যে অঙ্গ অপরাধে ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে উভয়টির কার্যকারিতা ও উপকারিতার মধ্যে সামঞ্জস্য থাকা জরুরী। এবং উভয়ের মূল্য সমপর্যায়ের হতে হবে। কেননা হত্যার চেয়ে নিম্ন পর্যায়ের অপরাধে শাস্তি ও অপরাধের মধ্যে সমতা থাকা আবশ্যক। সামঞ্জস্য না থাকলে কিসাস অকার্যকর হয়ে যাবে। উপরে উল্লেখিত সমতা বিদ্যমান থাকার পক্ষে ফকীহগণ আকলী ও নকলী উভয়বিধ দলীল উপস্থাপন করেছেন। এ সম্পর্কে মহান আল্লাহ তাআলার ঘোষণা ঃ 'জীবনের বদলে জীবন, চোখের বদলে চোখ, নাকের বদলে নাক, কানের বদলে কান, দাঁতের বদলে দাঁত এবং আঘাতের বদলে আঘাতে কিসাস প্রযোজ্য।' (সূরা মায়েদা ৪৫) অন্য আয়াতে বলা হয়েছে, 'তোমরা যদি শাস্তি দাও, তাহলে অদ্রূপ শাস্তি দাও যতটুকু তোমাদের আঘাত করা হয়েছে।' বস্তুত হত্যার চেয়ে নিম্নপর্যায়ের অপরাধে যে ক্ষয়ক্ষতি হয়ে থাকে, তা আর্থিক ক্ষয়ক্ষতির সাথে তুলনীয়। তাই এ ধরনের অপরাধে সমতা বজায় রাখা আবশ্যিক আর্থিক ক্ষয়ক্ষতির ব্যাপারে যেমন সমতা বজায় রাখতে হয়। আলকাসানী এ প্রসঙ্গে পূর্ণসামঞ্জস্য বিদ্যমান থাকার ব্যাপারে আলোচনা করেছেন। আলকাসানী বলেন, 'এসব ক্ষেত্রে অপরাধের কিসাস কার্যকরী করার জন্যে অপরাধের সমতুল্য শাস্তি প্রয়োগের অবকাশ থাকতে হবে। কারণ অপরাধের সমপরিমাণ শাস্তি প্রয়োগের অবকাশ না থাকলে কিসাস বাস্তবায়নের সুযোগই থাকবে না। বস্তুত তখন কিসাসের প্রায়োগিক আবশ্যকতা থাকবে না। দেখুন, তাবঈনুল হাকায়েক শরহে কানযুদ দাকায়েক, খণ্ড ৬, পৃষ্ঠা ১১১। নিহায়াতুল মুহতাজ ইলা শারহিল মিনহাজ খণ্ড ৭, পৃষ্ঠা ২৮। কাশশাফুল কিনা আন মাতানিল আকনা খণ্ড ৩, পৃষ্ঠা ৩৭৩ এবং এরপর।

৩. আলবাদায়ে আসসানায়ে, আলকাসানী, খণ্ড ৭, পৃষ্ঠা ২৭৭-২৯৯। বিদায়াতুল মুজতাহিদ ও নিহায়াতুল মুকতাসিদ, ইবনে রুশদ খণ্ড ২, পৃষ্ঠা ৩৩৯, আলকিসাস ফিশ শারীআতিল ইসলামিয়া, ড. আহমদ মুহাম্মদ ইবরাহীম, পৃষ্ঠা ২৫২, এবং এরপর।

৪. আধুনিক আইনের পরিভাষায় কোন অঙ্গ কেটে ফেলা কিংবা কোন অঙ্গের কার্যকারিতা সম্পূর্ণ বিনষ্ট করে ফেলাকে (Permanent infirmity) স্থায়ী ক্ষতি হিসেবে গণ্য করা হয়। মিসরীয়

দণ্ডবিধির ২৪০ নম্বর দফায় এ সম্পর্কে আলোচনা করা হয়েছে। এবং এ ধরনের অপরাধের দণ্ডনির্ধারণ করা হয়েছে। যেমন অন্যায়ভাবে কারো কোন অঙ্গ কেটে ফেলা, কারো শরীর থেকে কোন অঙ্গ বিচ্ছিন্ন করে ফেলা কিংবা কোন অঙ্গের উপকারিতা ও কর্মক্ষমতা বিনষ্ট করে ফেলা, কারো দৃষ্টিশক্তি নষ্ট করে দেয়া কিংবা কোন একটি চোখ তুলে ফেলা ইত্যাকার অপরাধগুলো ইসলামী আইনে অন্যায়ভাবে কারো অঙ্গ কেটে ফেলা কিংবা অঙ্গের কার্যকারিতা বিনষ্ট করে দেয়ার অপরাধের অন্তর্ভুক্ত। উল্লেখিত ধারায় এ বিষয়টি পরিষ্কার করে দেয়া হয়েছে। কেউ যদি অন্যায়ভাবে কাউকে জখম করে, অথবা এমনভাবে আঘাত করে কারো কোন অঙ্গ কেটে ফেলে বা বিচ্ছিন্ন করে ফেলে, অথবা আঘাতের কারণে কোন অঙ্গের উপকারিতা ও কার্যকারিতা বিনষ্ট অথবা আঘাতের কারণে দৃষ্টিশক্তি নষ্ট হয়ে যায়। কিংবা কোন একটি বা উভয় চোখ বেরিয়ে আসে অথবা আঘাতের কারণে আহত ব্যক্তির শরীরে এমন কোন ত্রুটি বা ক্ষতি সাধিত হয় যা কখনো পূরণ হবার নয়, তাহলে এমন অপরাধীকে (৩) তিন বছর থেকে (৫) পাঁচ বছর পর্যন্ত কারাদণ্ড দেয়া যেতে পারে। কিন্তু অপরাধী যদি এই অপরাধ ঘটানোর জন্যে পূর্ব থেকেই প্রস্তুতি নিয়ে থাকে, অথবা সুযোগের অপেক্ষায় থেকে থাকে তবে তাকে তিন বছর থেকে দশ বছর পর্যন্ত সশ্রম কারাদণ্ড দেয়া যায়।

৫. ইবনে রুশদ বিদায়াতুল মুজতাহিদ, খণ্ড ২ পৃষ্ঠা ৩৪০/৩৪১। আলমুগনী, ইবনে কুদামা খণ্ড ৯, পৃষ্ঠা ৪২৯। উল্লেখিত কিতাবসমূহে থাপ্পড়ের আঘাতে দৃষ্টিশক্তি নষ্ট হয়ে যাওয়া সম্পর্কে বলা হয়েছে, কাযী বলেন, থাপ্পড়ের আঘাতে যদি চোখের সিংহভাগ নষ্ট না হয়ে গিয়ে থাকে তাহলে কিসাস সাব্যস্ত হবে না। থাপ্পড়ের আঘাতে যদি চোখের সিংহভাগ বিনষ্ট না হয়ে যাকে তাহলে এটি ইচ্ছাসদৃশ অপরাধের সাথে তুলনীয় হবে এবং কিসাসের দণ্ড সাব্যস্ত হবে না। ইমাম শাফেয়ী উপরোক্ত মতামত ব্যক্ত করেন। কেননা সাধারণত এমন আঘাতে এ ধরনের ক্ষতি হয় না। তাই তাতে কিসাস কার্যকরী হবে না। কিন্তু ফকীহ্ আবু বকর র. বলেন, এ ধরনের সব ঘটনাতেই কিসাস কার্যকরী হবে। কেননা কুরআন কারীমে চোখের বদলে চোখ, শাস্তির বিধানটি অনির্দিষ্ট। বস্তুত থাপ্পড়ের আঘাতে যদি চোখ বেরিয়ে আসে তাহলে সেটি জখমের অন্তর্ভুক্ত। জখমে কিসাস কার্যকরী করার জন্যে অঙ্গহানি ঘটা আবশ্যিক নয়।

৬. বিস্তারিত অবগতির জন্য দেখুন আলকাসানী খণ্ড ৭, পৃষ্ঠা ২৯৭ এবং এরপর। তাবঈনুল হাকায়েক শরহে কানযু দ্দাকায়েক ইমাম যাইলাঈ, খণ্ড ৬, পৃষ্ঠা ১১১, বিদায়াতুল মুজতাহিদ, ইবনে রুশদ খণ্ড ২, পৃষ্ঠা ৩৪১। আল আহকামুস সুলতানিয়া, আলমাওয়ারদী, পৃষ্ঠা ২২১। কাশশাফুল কিনা আন মাতানিল আকনা, খণ্ড ৩, পৃষ্ঠা ৩৮০। তাতে বলা হয়েছে, উভয় অঙ্গের অভিন্ন নাম ও অবস্থান হতে হবে। সেই সাথে পরিপূর্ণতা ও সুস্থতার দিক থেকেও উভয় অঙ্গের মধ্যে সমতা থাকতে হবে। এতে লেখক এ দুটিকে স্বতন্ত্র দুটি শর্তরূপে উল্লেখ করেছেন। বস্তুত ভিন্ন ভিন্ন নয় প্রকৃতপক্ষে এই দুটি একই শর্তের অন্তর্ভুক্ত অর্থাৎ ক্ষতিগ্রস্ত অঙ্গ ও কিসাস প্রয়োগের অঙ্গের মধ্যে দুভাবে সমতা বিধান করতে হবে। আলমুগনী ইবনে কুদামা, খণ্ড ৯, পৃষ্ঠা ৪৩৮। এতে লেখা

হয়েছে, অধিকাংশ ফকীহর অভিমত, ডানের অঙ্গের কিসাস স্বরূপ বামের অঙ্গ এবং বামপাশের অঙ্গের বিপরীতে ডান পাশের অঙ্গের উপর কিসাস কার্যকরী হবে না। ইমাম মালেক র. ইমাম শাফেয়ী র. ইমাম আবু হানিফা র. ও ইমাম আহমদ ইবনে হাম্বল র. সবাই অভিন্ন মতপোষণ করেন। কেননা এসব অঙ্গের প্রত্যেকটির স্বতন্ত্র পরিচয় ও নাম রয়েছে। তাই একটির কিসাস অপর পাশের অঙ্গে প্রয়োগ করা যাবে না। হাতের বদলে যেমন পা কাটা যায় না। তারা আরো বলেন, ইবনে সীরীন ও শুরাইক র. বলেন, ডানের বদলে বাম এবং বামের বদলে ডান পাশের অঙ্গে কিসাস কার্যকরী করা যায়। কারণ গঠন ও উপকারিতার দিক থেকে ডান বাম একই ধরনের হয়ে থাকে। তারা আরো লিখেছেন, জমহুরের মতামত হলো, অনুভূতি রহিত হয়ে যাওয়া এবং নিষ্ক্রিয় অঙ্গের বিপরীতে সুস্থ সঠিক অঙ্গ কাটা যাবে না। কিন্তু ইমাম দাউদ জাহেরী র. সমতা রক্ষা করা সম্ভব না হলেও কিসাস কার্যকরী করাকে ওয়াজিব মনে করেন। তাঁর দৃষ্টিতে বিকলাঙ্গ ও নিষ্ক্রিয় হাতকেও হাতই বলা হয়। তাই কানের সাথে তুলনা করে অচল হাতের বদলে সুস্থ হাত কাটা যাবে। ফকীহ ইবনে কুদামা র. দাউদ জাহেরী র. এ মতের বিরোধিতা করে বলেন, অচল অঙ্গ মানব দেহের সৌন্দর্য বর্ধন ছাড়া আর কোন উপকারে আসে না। তাই এর পরিবর্তে কোন অনুভূতি সম্পন্ন সচল অঙ্গ কাটা যাবে না। যেমন একটি হাতকে বাঁকানো মোড়ানো যায় না। এমন হাতের বিপরীতে একটি সুস্থ হাত কাটা যাবে না। দাউদ জাহেরী র. এর বক্তব্য কিয়াস নির্ভর। অথচ তার অবস্থা এই যে কিয়াসকে তিনি স্বীকারই করেন না। দু'টি চোখ যদি সুস্থতা অসুস্থতা এবং দৃষ্টি শক্তির দিক থেকে ভিন্ন ধরনের হয় এমতাবস্থায় কিসাস কার্যকরী হয় না। অথচ চোখের বদলে চোখ অকাট্য দলীল দ্বারা সাব্যস্ত। বস্তুত যে অঙ্গের ব্যাপারে কোন প্রামাণ্য দলিলই নেই, তাতে কোন সংশয় ছাড়াই কিসাস অকার্যকর হবে।

৭. আলবাদায়ে আলকাসানী খণ্ড ৭, পৃষ্ঠা ৩০৮। কাসানী তাতে লিখেছেন, অপরাধী যদি নাকের হাড় কেটে ফেলে তাতে কোন কিসাস সাব্যস্ত হবে না। কেননা হাড়ের ক্ষেত্রে কোন কিসাস শরীয়ত নির্ধারণ করেনি। পৃষ্ঠা ২৯৮। একটি বাহুতে পেশী, কনুই এবং কাঁধের জোড়া থাকে তদ্রূপ পায়ে গোড়ালী, হাঁটুর জোড়া থাকে। জোড়া ছাড়া যদি অন্য কোন জায়গায় এসব অঙ্গ কাটে তবে কিসাস সাব্যস্ত হবে না।

কাশশাফুল কিনা আনমাতানিল আকনা, খণ্ড ৩, পৃষ্ঠা ৩৭৪। আরো দেখতে পারেন, আলমাদানিয়াতুল কুবরা খণ্ড ১৬, পৃষ্ঠা ১২৩, প্রকাশক, আসসাআদাত, মিসর, ১৩০১ হিজরী। বিদায়াতুল মুজতাহিদ, ইবনে রুশদ খণ্ড ২, পৃষ্ঠা ৩৭১। মাওয়াহিবুল জালীল, খণ্ড ৬, পৃষ্ঠা ২৪২/২৪৮ প্রথম প্রকাশ, ১৩২৯ হিজরী, মাতবা আসসাআদাত মিসর। ইমাম মালেক র. এর অভিমত হলো, অপরাধী যদি নাকের হাড় ও উপরের অংশ কেটে ফেলে তবে তাতে কিসাস দিতে হবে। এমতাবস্থায় অপরাধীর নাকের হাড়সহ অগ্রভাগ কেটে ফেলতে হবে। কারণ হাড়সহ নাক কাটা সম্ভব। ইমাম মালেক র. এর মতে, নাকের হাড় যদি কাটা সম্ভব হয় তবে তাতেও কিসাস কার্যকরী হবে। তার মতে অর্ধবাহুতেও কিসাস কার্যকরী হবে। যদি তা সঠিকভাবে কাটা সম্ভব হয়।

বুকের হাড়, ঘাড়, উরু পিঠের হাড় ইত্যাদি যেহেতু সঠিকভাবে কাটা কঠিন তাই তাতে কিসাস কার্যকরী হবে না।

৮. ইসলামী পরিভাষায় চেহারা ও মাথার আঘাতকে 'শাজাজ' বলা হয়। শাজাজ এগারো ধরনের। এ সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা সামনে করা হবে। এগারো ধরনের শাজাজ এর মধ্যে 'হাশিমা' বলা হয় এমন আঘাতকে যাতে মাথার হাড় ভেঙে যাবার পরও হাড় যথাস্থানে বহাল থাকে। এবং 'মুজিহা' বলে এমন মাথার আঘাতকে, যে আঘাতে গোশত এতোটাই উঠে যায় যার ফলে মাথার হাড় পরিষ্কার দেখা যায়। কিন্তু তাতে মাথার হাড়ে কোন আঘাত লাগে না।

৯. নিহায়াতুল মুহতাজ ইলা শারহিল মিনহাজ খণ্ড ৭, পৃষ্ঠা ৩১। তাতে লেখা হয়েছে, ক্ষতিগ্রস্ত ব্যক্তির এই অধিকার আছে, তার অঙ্গ যে স্থানে কাটা পড়েছে, সে অপরাধীর অঙ্গ ঠিক সেই স্থানের নিকটবর্তী জোড়ায় কাটার দাবি করবে। এক্ষেত্রে শর্ত হলো, যদি এমতাবস্থায় অপরাধীর পুরো অঙ্গ কেটে পূর্ণ কিসাস বাস্তবায়ন সম্ভব না হয় তখন আংশিকভাবেও কিসাস বাস্তবায়ন করার অবকাশ আছে। যে অংশে কিসাস কার্যকরী করার অবকাশ নেই, সেই অংশের জন্যে জরিমানা প্রাপ্তির অধিকার আছে। সূত্র আলমুহাযযার শিরাজী খণ্ড ২, পৃষ্ঠা ১৯২/১৯৩ মাতবাআ আলবাবী হালবী, কায়রো, সন ১৩৩৩ হিজরী। আলমুগনী ইবনে কুদামা, খণ্ড ৭, পৃষ্ঠা ৪১৬, আশশারহুল কাবীর খণ্ড ৯, পৃষ্ঠা ৪২৯।

১০. আলবাদায়ে আলকাসানী, খণ্ড ৭, পৃষ্ঠা ৩১১। তাতে লিখা হয়েছে, কারো অন্যায় আঘাতে যদি কারো কোমর বেঁকে যায় বা সোজা হয়ে দাঁড়াতে না পারে অথবা কোন হাড় ভেঙে ভেতরের ক্যালসিয়াম বা মগজ বেরিয়ে পড়ে এমতাবস্থায় কোন কিসাস কার্যকরী করার সুযোগ নেই। এই অপরাধে অপরাধীর উপর জরিমানা আরোপ করতে হবে।

১১. আলবাদায়ে আলকাসানী, খণ্ড ৭, পৃষ্ঠা ৩০৮। তাতে লেখা হয়েছে, চোখের পাপড়ীর ক্ষয়ক্ষতিতে কোন কিসাস ধার্য হবে না। কারণ তাতে অপরাধের সমপরিমাণ শাস্তি কার্যকর করা সম্ভব নয়। সূত্র মাওয়াহিবুল জলীল খণ্ড ৬, পৃষ্ঠা ৩৪৭, আলমুগনী, ইবনে কুদামা খণ্ড ৯, পৃষ্ঠা ৪৩৩, নিহায়াতুল মুহতাজ ইলা শারহিল মিনহাজ খণ্ড ৭, পৃষ্ঠা ৩০। আলমুহাযযাব, আশশিরাজী খণ্ড ২, পৃষ্ঠা ১৯১।

১২. আলবাদায়ে, আলকাসানী খণ্ড ৭, পৃষ্ঠা ৩১১। অন্ডকোষ কারো দ্বারা ক্ষতিগ্রস্ত হলে এর বিপরীতে কিসাস ধার্য হবে না। কারণ এর কোন নির্ধারিত সীমা বা গোড়া নেই যেখানে গিয়ে শাস্তিকে থামিয়ে দেয়া যাবে। তাই অপরাধ ও শাস্তির মধ্যে সমতা বিধান সম্ভব হবে না। আলমুগনী খণ্ড ৯, পৃষ্ঠা ৪২৬, কাশশাফুল কিলা আনমাতানিল আকনা, খণ্ড ৩, পৃষ্ঠা ৩৭৮। নিহায়াতুল মুহতাজ ইলা শারহিল মিনহাজ খণ্ড ৭, পৃষ্ঠা ৩০, ৩১।

১৩. আলবাদায়ে, আলকাসানী, খণ্ড ৭, পৃষ্ঠা ৩০৮। তাতে বলা হয়েছে, যদি কারো আঘাতে চোখ দেবে যায় তবে তাতে কিসাস নেই। কারণ অপরাধীকে অনুরূপ আঘাত করলে তার চোখ নাও দাবতে পারে। তখন তা ক্ষতিগ্রস্তের দাবী পূরণ বলে গণ্য হবে না। সূত্র আলমুগনী, ইবনে কুদামা

খণ্ড ৯ পৃষ্ঠা ৪২৮। এতে বলা হয়েছে, অপরাধী যদি তার আঙুল দিয়ে ক্ষতিগ্রস্তের চোখ বের করে ফেলে তাহলে ক্ষতিগ্রস্ত ব্যক্তির জন্যে তা জায়েয হবে না, সেও তার আঙুল দিয়ে অপরাধীর চোখ তুলে ফেলবে। কেননা এতে অপরাধ ও শাস্তির মধ্যে সমতা সম্ভব হবে না। সূত্র, মাওয়াহিবুল জলীল, পৃষ্ঠা ২৪৮/২৪৯, কাশশাফুল কিনা আনমাতানিল আকনা খণ্ড ৩, পৃষ্ঠা ৩৭৫, নিহায়াতুল মুহতাজ ইলা শারহিল মিনহাজ, খণ্ড ৭, পৃষ্ঠা ৩০। এতে গ্রন্থকার বলেন, চোখ উপড়ে ফেলার অপরাধে কিসাস ওয়াজিব কারণ চোখের একটা নির্দিষ্ট সীমা আছে, যে সীমাটা জোড়ার মতো।

১৪. আলবাদায়ে আলকাসানী, খণ্ড ৭, পৃষ্ঠা ৩০৯। এতে লেখা হয়েছে, মাথার আঘাতে যদি জ্ঞান বুদ্ধি, বাকশক্তি, স্বাদ, অনুভূতি, ঘ্রাণ শক্তি, যৌন শক্তি লোপ পায় তাতে কোন কিসাস হবে না। কারণ ক্ষতিগ্রস্ত ব্যক্তির পক্ষে সম্ভব নয় অপরাধীকে এমন আঘাত করা যে আঘাতে অপরাধীর এসব ইন্দ্রিয়শক্তি লোপ পাবে। বস্তুত এক্ষেত্রে অপরাধের সমপরিমাণ শাস্তি প্রয়োগ অসম্ভব। একই কিতাবের ৩০৭ পৃষ্ঠায় লিখা হয়েছে, ইসলামী শরীয়তে বাকশক্তি শ্রবণশক্তি এবং যৌনশক্তি বিনষ্ট হওয়ার অপরাধে জরিমানাই শাস্তি হিসেবে নির্ধারণ করতে হবে। আরো বিস্তারিত দেখা যেতে পারে পৃষ্ঠা ৩১১ ও ৩১২তে।

১৫. আলবাদায়ে আলকাসানী, খণ্ড ৭, পৃষ্ঠা ৩০৭। ক্ষতিগ্রস্তের যদি উভয় চোখ নষ্ট হয়ে গিয়ে থাকে, এমতাবস্থায় ইমাম মুহাম্মদ র. সূত্রে নাওয়াদের কিতাবের লেখক বর্ণনা করেন, এ ধরনের অপরাধে কিসাস ওয়াজিব। বস্তুত দৃষ্টিশক্তি বিনষ্ট হওয়ার অপরাধেও কিসাস ওয়াজিব। সূত্র তাবঈনুল হাকায়েক, শরহে আলকানয, ইমাম যাইলাঈ, খণ্ড ৬, পৃষ্ঠা ১১১। তাতে লেখা হয়েছে, চোখের দৃষ্টিশক্তি যদি নষ্ট হয়ে যায় আর চোখ যথাস্থানে বহাল থাকে, তবে তাতে কিসাস কার্যকরী হবে।

১৬. আলমুগনী, ইবনে কুদামা, খণ্ড ৯, পৃষ্ঠা ৪২৮ এবং এরপর।

১৭. নিহায়াতুল মুহতাজ, ইলা শারহিল মিনহাজ খণ্ড ৭, পৃষ্ঠা ৩২।

১৮. কাশশাফুল কিনা আনমাতানিল আকনা খণ্ড ৩৭৯/৩৮০। আলমুগনী ইবনে কুদামা খণ্ড ৯, পৃষ্ঠা ৪২৮।

১৯. হাশিয়া আদদাসুকী আলা শারহিদ দারুবিয়া খণ্ড ৪, পৃষ্ঠা ২৯৬, মাতবা আযহার, ১৩০১ হিজরী। মাওয়াহিবুল জালিল শারহি মুখতাসার আলখালীল খণ্ড ৬, পৃষ্ঠা ২৪৮।

২০. বিদায়াতুল মুজতাহিদ ও নিহায়াতুল মুকতাসিদ, ইবনে রুশদ খণ্ড ২, পৃষ্ঠা ৩৪১।

অনুবাদ : শহীদুল ইসলাম

ইসলামী আইন ও বিচার
জানুয়ারী-মার্চ ২০০৭
বর্ষ ৩, সংখ্যা ৯, পৃষ্ঠা : ৬৯-৭৮

ইসলামী আইনের বিকৃতি ও হিলার অপব্যবহার

ড. মুহাম্মদ আবু ইউসুফ

ইসলাম একটি পূর্ণাঙ্গ জীবন বিধান। মানুষের ইহকালীন কল্যাণ ও পরকালীন মুক্তির জন্য মহান রব্বুল আলামীন মানবতার জন্য এ বিধান নাযিল করেন। যেহেতু আল্লাহ রব্বুল আলামীন মানুষের স্রষ্টা সেহেতু তিনি জানেন কি ধরনের বিধি-বিধান মানুষের জন্য উপযোগী ও কল্যাণকর সে ধরনের বিধানই তিনি মানুষের জন্য নির্ধারণ করেছেন। এমনি ধরনের বিধি-বিধানের অন্তর্ভুক্ত হিসেবে আমরা দেখি বিবাহ, তালাক ইত্যাদি। অনেক সময় মানুষ শয়তানের প্ররোচণায় আল্লাহর বিধানের যথাযথ অনুসরণ না করে এর বিপরীত চলার মাধ্যমে তৃপ্তি লাভ করে। এরকমই একটি অবস্থা হল, আমাদের সমাজে প্রচলিত হিলার বিধান। সমাজের মানুষ পবিত্র কুরআন ও হাদীসের বিপরীত নিয়ম নীতি চালু করার মাধ্যমে সামাজিক বিপর্যয়ের সৃষ্টি করেছে। ফলে ইসলাম সম্পর্কে অজ্ঞ একদল লোক না বুঝে ইসলামকে দোষারোপ করে। আরেক দল লোক ভুল পন্থাকেই ইসলাম মনে করছে। আলোচ্য প্রবন্ধে আমরা হিলা সম্পর্কিত আমাদের সমাজে প্রচলিত ভুল ধারণা তুলে ধরার সাথে সাথে এ সম্পর্কিত পবিত্র কুরআন ও হাদীসের আসল বিধান তুলে ধরার চেষ্টা করব।

তালাক ও তাহলীলের ইসলামী পদ্ধতি

নারী ও পুরুষ দুইজনের মধ্যকার বিবাহ বন্ধন হলো একটি 'সামাজিক চুক্তি' যা ইসলামী শরীয়তের বিবাহ আইন দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হয়। তালাক, খোলা, মুবারাত ইত্যাদি পন্থায় বা উভয়ের কারো মৃত্যুতে এ চুক্তির অবসান ঘটে। তালাকের সংখ্যা ও পদ্ধতি সম্পর্কে কুরআন মজীদে স্পষ্টভাবে বলে দেয়া হয়েছে। শরীয়া আইন মোতাবেক স্বামী লিখিতভাবে বা মৌখিক উচ্চারণের মাধ্যমে স্ত্রীকে উদ্দেশ্য করে তালাক প্রদান করলেই তা কার্যকর হয়।

অধিকাংশ লোকই তালাকের সহজতর পদ্ধতি সম্পর্কে অবহিত নয়। তাই দেখা যায়, কোন ব্যক্তি তার স্ত্রীকে এক সাথেই তিন তালাক দিয়ে বসে। অতপর বাস্তব পরিস্থিতির সম্মুখীন হয়ে মিথ্যাচার ও ছল-চাতুরীর আশ্রয় নেয়। তারা জানে না যে, তিন তালাক উচ্চারণের মাধ্যমে তারা যা করতে চায় তা এক তালাক দ্বারাও সম্পন্ন করা যায়। যেমন–

এক. কোন ব্যক্তি যদি অনিবার্য কারণে বৈবাহিক সম্পর্ক ছিন্ন করতে চায় তবে সে এক তালাক উচ্চারণ করবে। এমতাবস্থায় তিনটি মাসিক ঋতু অতিবাহিত হওয়ার পর তার দেয়া তালাক

লেখক : সহযোগী অধ্যাপক, রাষ্ট্রবিজ্ঞান বিভাগ, জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়, গাজীপুর।

কার্যকর হবে। তখন স্ত্রীলোকটি ইচ্ছা করলে অন্য স্বামী গ্রহণ করতে পারবে অথবা উভয়ে পুনর্বার অত্যন্ত সহজ পন্থায় ঈজাব কবুলের মাধ্যমে দাম্পত্য বন্ধনে ফিরে আসতে পারবে।

দুই. দুই তালাক প্রদান করা হলে সেক্ষেত্রেও ফলাফল একই রকম। অর্থাৎ বিষয়টি জটিলতামুক্ত থাকবে। কুরআন মজীদে এদিকে ইংগিত করে বলা হয়েছে : 'তালাক দুইবার। অতপর হয় স্ত্রীকে বিধিমত রেখে দিবে অথবা সদয়ভাবে মুক্ত করে দিবে।'[১]

তিন. কিন্তু তিন তালাক দেয়া হলে বিষয়টি অত্যন্ত জটিল হয়ে যায়। সেক্ষেত্রে এক বা দুই তালাকের ক্ষেত্রের সুবিধা আর অবশিষ্ট থাকে না। তখনই 'তাহলীল'-এর প্রশ্ন আসে। এ সম্পর্কে কুরআন মজীদে পরবর্তী আয়াতে বলা হয়েছে : 'অতপর যদি সে তাকে (তৃতীয়) তালাক দেয় তবে সে (স্ত্রী) তার (স্বামীর) জন্য হালাল (বৈধ্য) হবে না, যে পর্যন্ত সে (স্ত্রী) অন্য স্বামীর সাথে বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ না হয়। অতপর সে দ্বিতীয় স্বামী যদি তাকে তালাক দেয় আর তারা উভয়ে (পূর্ব স্বামী-স্ত্রী) মনে করে যে, তারা আল্লাহর সীমারেখা রক্ষা করতে সমর্থ হবে, তবে তাদের পুনর্বিবাহে কারো কোন অপরাধ হবে না। এগুলো আল্লাহর বিধান, জ্ঞানী সম্প্রদায়ের জন্য আল্লাহ তা স্পষ্টভাবে বর্ণনা করেন।'[২]

উপরোক্ত আয়াতে ব্যবহৃত 'তাহিল্লু' ক্রিয়াপদ থেকে 'তাহলীল' পরিভাষা প্রবর্তিত হয়েছে যার আভিধানিক অর্থ 'বৈধকরণ' এবং পারিভাষিক অর্থ হচ্ছে, 'স্ত্রীকে তিন তালাক প্রদান করা হলে তাকে পুনর্বার বিবাহ বন্ধনে ফিরিয়ে আনার প্রক্রিয়া'। এই তাহ্‌লীল শব্দটিকেই লোকেরা হিলা (অপকৌশল)-তে রূপান্তরিত করে নিয়েছে (সামনে বিস্তারিত আসছে)।

আল্লাহ তাআলা মানুষকে উপরোক্ত রূপ সহজতর পন্থা বলে দেয়ার পরও যারা তিন তালাকের জটিল সমস্যায় নিজেদের নিক্ষেপ করে তাদের জন্য ইসলামী আইন দায়ী নয়। আইনের সহজ বিধান লংঘন করে যারা কঠোরতার দিকে যাবে তাদেরকে কঠিন পরিস্থিতির স্বীকার হতেই হবে। এটা কেবল ধর্মীয় আইনের ক্ষেত্রেই নয়, পার্থিব আইনেও তাদের কঠিন পরিস্থিতির স্বীকার হতে হয়।

এখানে আরো একটি বিষয় লক্ষণীয় যে, কোন ব্যক্তি আইনের আওতাভুক্ত কোন অপরাধ করলে ইসলামী বিধানমতে তার শাস্তি কেবল দেশের প্রশাসনিক কর্তৃপক্ষই কার্যকর করতে পারে, ব্যক্তিবিশেষ বা সংস্থার তা কার্যকর করার কোন এখতিয়ার নেই। কেউ অনধিকার চর্চা করলে সেই আইনের আওতায় শাস্তিযোগ্য হবে।

তালাক ও হিলা বিবাহ সম্পর্কে নিম্নে কয়েকটি ঘটনা বিশ্লেষণে সহজেই বুঝা যায়, আমাদের সমাজে তালাক ও তাহলীল ব্যবস্থা নিয়ে কীসব ঘটনা ঘটে ও ঘটছে।

হিলা বিবাহ সম্পর্কে একটি কেসস্টাডি : বিগত ০২ ডিসেম্বর, ২০০০ সালে "নওগাঁর গ্রামে আজ ফতোয়াবাজদের সালিসে ভাগ্য নির্ধারণ হবে গৃহবধূ সাহিদার" শিরোনামে দৈনিক বাংলাবাজার পত্রিকায় প্রকাশিত নিম্নোক্ত রিপোর্টের ভিত্তিতে হাইকোর্ট সুয়োমোটো রুল জারির মাধ্যমে যে কোন ধরনের ফতোয়া দানকে নিষিদ্ধ ঘোষণা করে। রিপোর্টের ভাষা ছিল এমন : নওগাঁর সদর

উপজেলার আতিখা গ্রামে আজ শনিবার ফতোয়াবাজরা ডেকেছে সালিস। আজ নির্ধারিত হবে ফতোয়াবাজদের শিকার গৃহবধূ সাহিদার ভাগ্য। এ নিয়ে এলাকায় হৈ চৈ পড়ে গেছে। এদিকে পিত্রালয়ে অবস্থানরত সাহিদার কান্নায় মহাদেবপুর উপজেলায় শরিজপুর গ্রামে নেমেছে শোকের ছায়া। যাতে সাহিদাকে ঘরে তুলতে না হয় সেই লক্ষে বৈঠকে গোলযোগের প্রস্তুতি নিচ্ছে স্বামী ছাইফুল। কীর্তিপুর ইউপি চেয়ারম্যান আঃ জব্বার সাহিদা বৈঠকে বসতে ভয় পাচ্ছে বলে জানালেন। তিনি তাই তার নিজ বাড়ির খলিয়ানে আজ শনিবার সকাল ৯টায় বৈঠকের ব্যবস্থা করেছেন। বৈঠকে সকল পক্ষের কাছে শুনে তারা সিদ্ধান্ত নিবেন। যদি সিদ্ধান্ত নেয়া সম্ভব না হয় তবে শাহিদাকে আইনগত ব্যবস্থা নেয়ার পরামর্শ দেয়া হবে। ১০ মাসের এক কন্যার জননী সাহিদা তার স্বামীর সংসার করতে চায়। সদর উপজেলার কীর্তিপুর ইউনিয়নের আতিখা গ্রামের মোস্তফার পুত্র ছাইফুলের সাথে দেড় বছর পূর্বে তার বিয়ে হয়। প্রায় এক বছর পূর্বে সাহিদার গর্ভে পাঁচ মাসের বাচ্চা থাকা অবস্থায় পারিবারিক কলহে ছাইফুল মৌখিকভাবে স্ত্রীকে তালাক দেয়ার কথা উচ্চারণ করে। পরবর্তীতে রাগ কেটে গেলে তারা স্বাভাবিকভাবে ঘর সংসার করতে থাকে। কিন্তু বাদ সাধে একই পরিবারের হাজী আজিজুল হক। সে ফতোয়া দেয় সাহিদাকে তালাক দিয়ে অন্যত্র বিয়ে দিয়ে আবার সেখান থেকে তালাক নিয়ে ছাইফুলের সাথে পুনরায় বিয়ে দিলে তাদের বসবাস সম্ভব, নইলে মহাপাপ হবে। সাহিদার স্বামী, শ্বশুর, শাশুড়ি একত্রে ফতোয়াবাজের সাথে একত্র হয়ে এ পরিকল্পনা সাহিদাকে জানায়। সাহিদা এতে বাদ সাধলে গত ১৬ নভেম্বর রাত ১১টার দিকে জোরপূর্বক রাজি করিয়ে নামমাত্র বিয়ে হবে বুঝিয়ে সাহিদাকে তার চাচাতো দেবর সামছুলের সাথে বিয়ে দেয়ার জন্য ছাইফুলের কাছ থেকে তালাক নিয়ে একই বৈঠকে হাজী আজীজুলের বাড়িতে সামছুলের সাথে বিয়ে দেয় এবং তার ঘরে জোরপূর্বক তুলে দেয়। দু'দিন পর পুনরায় সামছুলের কাছ থেকে তালাক করিয়ে নিয়ে সুকৌশলে সাহিদাকে তার বাবার বাড়ি পাঠিয়ে দেয়া হয়। তাকে আশ্বাস দেয়া হয় দু'তিন মাস পরে তাকে স্বামী ছাইফুলের সাথে বিয়ে পড়িয়ে ঘর সংসার করার অনুমতি দেয়া হবে। কিন্তু তা আর হলো না। স্বামীর পরিবার থেকে জানিয়ে দেয়া হয় তাকে আর নেয়া হবে না।

এদিকে স্থানীয় চেয়ারম্যান আঃ জব্বারসহ উক্ত ফতোয়াবাজ হাজী আজীজুল আজ আতিখা গ্রামে সালিস ডেকেছে সাহিদার বিষয়ে ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য। সাহিদাকেও সালিসে থাকতে বলা হয়েছে। এ ব্যাপারে এলাকায় ব্যাপক হৈ চৈ পড়লেও প্রশাসনের পক্ষে কোন উদ্যোগ নেই। অসহায় সাহিদা স্বামীর সংসার করতে চায়। এদিকে স্বামী ছাইফুলসহ তার পরিবারের সবাই তাকে গ্রহণ করতে চায় না। সালিসদার ফতোয়াবাজরা এ অবস্থায় আজ কি ঘটাবে সাহিদার ভাগ্যে, সেদিকে তাকিয়ে রয়েছে নিরীহ গ্রামবাসী। গ্রামবাসীর সাথে কথা বলে জানা গেছে, প্রভাবশালী ফতোয়াবাজদের ভয়ে কেউ প্রতিবাদ করতে পারছে না। হাজী আজিজুল গা ঢাকা দিয়ে রয়েছে।[৩]

উপরোক্ত রিপোর্টের উপর নির্ভর করে হাইকোর্টের বিতর্কিত বিচারপতি গোলাম রব্বানী ফতোয়া নিষিদ্ধের ঘোষণা দিয়ে বিতর্কের ঝড় তোলেন। অবশ্য পরবর্তীতে সুপ্রীমকোর্ট এই রায় বাতিল

ঘোষণা করেন। ইসলামের প্রতি অনুরাগী এ দেশের জনগণের মধ্যে কেন এবং কিভাবে হিলা নামক ইসলাম বিরোধী এ নীতি চালু হয়েছে তা আজ এক বিরাট প্রশ্ন। এ ধরনের ঘটনা ইতোপূর্বে বাংলাদেশে অনেক ঘটেছে। এসব ঘটনায় যারা ফতোয়া জারি করেছে তাদের প্রায় সবাই কুরআন হাদীস সম্পর্কে সম্পূর্ণরূপে অজ্ঞ। এদের অজ্ঞতা প্রসূত মতামতের কারণে এ পর্যন্ত প্রাণহানিসহ অনেক বিপর্যয় ঘটেছে। একটি কথা দৃঢ়তার সাথে বলা দরকার। তা হল, বিজ্ঞ আলেমদের ফতোয়ায় এ পর্যন্ত কোথাও কোন ধরনের অঘটন ঘটেনি।

'হিলা'[৪] শব্দের আভিধানিক অর্থ কর্তব্য পালন এড়াবার কৌশল।[৫] ইসলামী শরীয়তে আইনের অপব্যবহারকে 'হিলা' (অপকৌশল) এবং তিন তালাক দেয়া স্ত্রীকে পুনরায় বিবাহ বন্ধনে ফিরিয়ে আনার পদ্ধতিকে তাহলীল (বৈধকরণ) বলা হয়। কোন অবৈধ কাজকে বৈধ করার জন্য উদ্দেশ্যমূলকভাবে যে ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয় তাকেও হিলা বলা হয়। তালাক এড়ানোর জন্য আমাদের সমাজে যে অপকৌশল অবলম্বন করা হয় তাও আমাদের সমাজে হিলা নামে পরিচিত। সাধারণত তিন তালাকপ্রাপ্তা কোন মহিলা যদি তার তালাকদাতা স্বামীর কাছে ফিরে যাবার জন্য উদ্দেশ্য প্রণোদিতভাবে কোন বিবাহ ব্যবস্থা গ্রহণ করে তাই হিলা পদ্ধতি হিসেবে পরিচিত। লোকেরা ইসলামী শরীয়ত নির্দেশিত তালাকের পন্থা অনুসরণ না করে যখন তখন একই সাথে তিন তালাক দিয়ে বসে। কয়েক ঘণ্টার ব্যবধানে পরিস্থিতির ভয়াবহতা অনুভব করে এবং নিজের কৃত ভুলের জন্য অনুতপ্ত হয়। এমতাবস্থায় তারা নিজেদের দাম্পত্য জীবন অব্যাহত রাখে। ইসলাম সম্পর্কে অজ্ঞ বা অর্ধ-শিক্ষিত লোকেরা এ ক্ষেত্রে ফতোয়া জারী করে বসে এবং অজ্ঞতাপ্রসূত ধর্মবোধে উজ্জীবিত হয়ে হিলা নামক ভুল পন্থার চর্চা করে।

ইসলামী শরীয়তে নিকাহ-এ মুহাল্লাল এর ব্যবস্থা রয়েছে। নিকাহ-এ মুহাল্লাল এমন বিয়েকে বলা হয় যা শুধুমাত্র পূর্বতন স্বামীর কাছে ফিরে যাওয়াকে বৈধ বা হালাল করার পূর্ব শর্ত। তালাকদাতা স্বামীর কাছে পুনরায় ফিরে যাবার বিবাহ পদ্ধতিকে প্রায় সব ইমামই তাদের মাযহাবে নিকাহ তাহলীল বা নিকাহ মুহাল্লাল হিসেবে উল্লেখ করেছেন।[৬]

আমাদের দেশের লোকদেরকে সাধারণত ধর্মভীরু বলা হয়, কারণ দেশের অধিকাংশ মানুষের মধ্যে ধর্মীয় আবেগ অনুভূতি যত তীব্র, শরীয়তের মৌলিক ভিত্তি কুরআন ও হাদীস মোতাবেক জীবনের সামগ্রিক দিক ও বিভাগ পরিচালনার ক্ষেত্রে তাদের তত আগ্রহ ও আন্তরিকতা দেখা যায় না। ঠিক একইভাবে আমরা লক্ষ্য করি তালাক দানের ক্ষেত্রে শরীয়তের বিধান মোটেও মান্য করা হয় না। বরং খেয়াল-খুশিমত যখন তখন যেভাবে মন চায় সেভাবে তালাক দেয়া হয়। আবার একইভাবে তালাক দানের পর যখন পারিবারিক বিপর্যয়ের সম্মুখীন হয়ে পড়ে তখন আবার যেনতেনভাবে শরীয়তের বিধান উপেক্ষা করে স্ত্রীকে পাওয়ার জন্য মরিয়া হয়ে পড়ে। এ ধরনের তালাকদাতার উদ্বেগ ও অসাহয়ত্বের সুযোগে একশ্রেণীর অশিক্ষিত ও অর্ধশিক্ষিত ধর্মানুরাগী মানুষ কথিত হিলা ব্যবস্থা চাপিয়ে দেয়।

আমাদের দেশে প্রচলিত হিলার যে ব্যবস্থা রয়েছে তা সত্যিই দুঃখজনক ও নিন্দনীয়। এখানে হিলার নামে এক ধরনের প্রতারণার আশ্রয় নেয়া হয়। এ প্রতারণা মূলত করা হয় আল্লাহ্ ও তার রসূলের স. সাথে। কোন ব্যক্তি তার স্ত্রীকে তালাক দেয়ার পর পুনরায় তাকে পাওয়ার জন্য ব্যাকুল হয়ে পড়েন এবং তালাক দানের পরই কেবল ভুল বুঝতে পারেন, তালাক দেয়ার সময় নয়। ভুল সংশোধনের জন্য একজনকে ঠিক করে তার নিকট শর্তসাপেক্ষে বিয়ে দেয়া হয়। শর্ত হল এরূপ-নির্দিষ্ট সময়ের পর তাকে তালাক দিয়ে দেবে। তার সাথে রাত্রি যাপনে একবার মাত্র যৌনমিলন করবে আবার কখনো তা না করার শর্ত দেয়া হয়। হিলাকারী উক্ত মহিলাকে তালাক দিলে তার পূর্বতন স্বামী তাকে বিয়ে করে এবং পূর্বের ন্যায় ঘর সংসার করে।

আমাদের সমাজে হিলা বিয়ের নামে যে কুপ্রথার প্রচলন রয়েছে নিম্নের উদাহরণ থেকে বিষয়টি আরো স্পষ্ট হয়ে যাবে। বগুড়া জেলার আদমদীঘি থানার কুন্দুগ্রাম ইউনিয়নের শিববাটি গ্রামের জয়দেবপুর পাড়ায় ঘটনাটি ঘটে। 'মুর্শিদার ভাষ্য মোতাবেক বিগত সাত বছর পূর্বে একই গ্রামের প্লাস্টিক সামগ্রী বিক্রেতা আব্দুর রহীমের সাথে তার বিয়ে হয়। অভাবের কারণে তাদের মধ্যে ছোটখাট ঝগড়া প্রায়ই লেগে থাকত। ঘটনার দিন এ ধরনের ঝগড়া চলার সময় হঠাৎ স্বামী তাকে মৌখিক তালাক দিয়ে বসে। পরে তালাক উচ্চারণ করা তার ভুল হয়েছে স্বীকার করলেও বেঁকে বসেন গ্রামের সমাজপতিরা। গ্রামের মান্নান মুন্সী সালিশ বসিয়ে পৃথক করে দেন স্বামী ও স্ত্রীকে। এক সময় গ্রাম থেকে তাড়িয়ে দেয়া হয় স্বামী আঃ রহীমকে। তিনটি সন্তান নিয়ে দারুণ কষ্টের মধ্যে পড়ে মুর্শিদা। স্বামীকে ফিরে পাওয়ার আশায় সে ঘুরতে থাকে সমাজপতিদের দ্বারে দ্বারে। এ সময় মান্নান মুন্সী ফতোয়া জারি করেন হিলা বিয়ে ছাড়া স্বামীকে ফিরে পাওয়ার কোন পথ নেই। হিলা বিয়েতে রাজী করানো হয় মুর্শিদাকে। গ্রামে কোন পাত্র না পাওয়ায় পার্শ্ববর্তী আলতাফনগর স্টেশন থেকে প্রায় ৭০ বছরের এক বৃদ্ধ ফকিরকে ধরে এনে বিয়ে পড়িয়ে দেয়া হয় মুর্শিদার সাথে। বিয়ে পড়ান মান্নান মুন্সী নিজেই। বৃদ্ধের সঙ্গে বিয়ের পর মুর্শিদার এখন চলছে ৩ মাস ১৩ দিনের ইদ্দতকালীন সময়। স্বামী আব্দুর রহিম এখনও গ্রামছাড়া। মুর্শিদা জানায় তার স্বামীকে ফিরে পাবার জন্য সমাজপতিদের চাপিয়ে দেয়া এ কঠিন সিদ্ধান্ত তিনি মেনে নিয়েছেন।'[৭]

উপরোক্ত ঘটনাটি পবিত্র কুরআন ও হাদীসের বিধানের সাথে তামাশা করা ছাড়া আর কিছুই নয়। অবশ্য এসবই করা হয়ে থাকে ইসলামের নামে। মুর্শিদাকে বৃদ্ধ ফকিরের সাথে বিয়ে দিয়ে ইসলামী শরীয়তের কি অনুসরণ করা হলো? দেখা দরকার তাদের তালাক হয়েছে কিনা? যদি তালাক না হয়ে থাকে তবে এ ধরনের প্রহসনের কোনই প্রয়োজন পড়ে না। আর যদি তালাক হয়ে থাকে তবে কয়টি তালাক? তিন তালাক হলে পূর্বের স্বামীর সাথে মুর্শিদাকে এভাবে বিয়ে দেয়ার কোনই সুযোগ নেই।

সহীহ হাদীস থেকে জানা যায়, যদি কোনো ব্যক্তি নিজের তালাক দেয়া স্ত্রীকে নিছক নিজের জন্য হালাল করার উদ্দেশ্যে চক্রান্তমূলকভাবে কারো সাথে বিবাহ দেয় এবং প্রথম থেকে তার সাথে এই চুক্তি করে নেয় যে, বিবাহ করার পর সে তাকে তালাক দেবে, তাহলে এটা হবে একটি সম্পূর্ণ

অবৈধ কাজ। এই ধরনের বিবাহ মোটেই বিবাহ বলে গণ্য হবে না। বরং এটি হবে নিছক একটি ব্যভিচার। আর এই ধরনের বিবাহ ও তালাকের মাধ্যমে কোনোক্রমেই কোনো মহিলা তার সাবেক স্বামীর জন্য হালাল হয়ে যাবে না। হযরত আলী রা., ইবনে মাসউদ রা., আবু হুরায়রা রা. ও উকবা ইবনে আমের রা. প্রমুখ সাহাবগণ নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে একযোগে রিওয়ায়াত করেছেন যে, তিনি এইভাবে তালাক দেয়া স্ত্রীদের যারা হালাল করে এবং যাদের মাধ্যমে হালাল করা হয় তাদের উভয়ের ওপর লানত বর্ষণ করেছেন।[৮] পবিত্র কুরআনের আলোচ্যে আয়াত হতে দু'টি জিনিস অন্তত পরিষ্কার হয়েছে। তা হলো, কোন মানুষ তার স্ত্রীকে চূড়ান্তভাবে তালাক দিলে কেবলমাত্র এভাবে পুনরায় বিয়ে করা যাবে ঃ প্রথমত, উক্ত মহিলার অন্য পুরুষের সাথে শর্তবিহীন ও উদ্দেশ্যহীনভাবে বিয়ে হতে হবে। দ্বিতীয়ত, উক্ত স্বামীর সাথে তাদের স্বাভাবিক নিয়মে দাম্পত্য জীবন পরিচালিত হবে। এমতাবস্থায় যদি স্বামী মারা যায় অথবা কারো চাপাচাপি অথবা প্ররোচণা অথবা কোন ধরনের প্রলোভন ব্যতীত তাদের মধ্যে বিবাহ বিচ্ছেদ ঘটে তবে পূর্বতন স্বামী ইচ্ছা করলে তাকে পুনরায় বিয়ে করতে পারবে। কিন্তু আয়াতের শেষাংশে একটি শর্ত জুড়ে দেয়া হয়েছে, তাদের উভয়কেই পুনর্বিবাহে আবদ্ধ হওয়ার আগেই চিন্তা করে দেখতে হবে যে, তারা আল্লাহর নির্ধারিত সীমারেখা বজায় রাখতে পারবে কিনা। অর্থাৎ তাদের উভয়ের মধ্যে বিবাহ বিচ্ছেদের মত একটি ঘটনা ঘটে যাওয়ার পর পুনরায় যেন রাগান্বিত হয়ে কেউ কারো উপর কোন ধরনের অন্যায় আচরণ করে না বসে। অতএব ইসলামে তড়িঘড়ি করে যেমন কথায় কথায় তালাক দানের সুযোগ নেই, তেমনি যেনতেনভাবে স্ত্রীকে আবার ফিরিয়ে আনারও অবকাশ নেই।

আল্লামা আলুসীর মতে আয়াতাংশে 'যাওজান' শব্দ দ্বারা দ্বিতীয় বিবাহ এবং 'তানকেহু' শব্দ দ্বারা সহবাস করা বুঝায়।[৯] পবিত্র কুরআনের আলোচ্য আয়াতের মত হাদীস থেকেও সহবাসের শর্ত বুঝা যায়। তবে এ সহবাসের শর্ত বলতে শর্ত সাপেক্ষে কারো সাথে এক বার সহবাসের শর্তে বিবাহ দেয়া নয়, বরং স্বাভাবিক দাম্পত্য জীবনকে বুঝানো হয়েছে। এ বিষয়টি নিম্নোক্ত হাদীস থেকে আরও স্পষ্ট হয়ে যায়। রাকায়া নামক এক ব্যক্তির প্রাক্তন স্ত্রী এসে রসূলে করীম স. এর খেদমতে আরজ করলেন, আমি বর্তমানে আব্দুর রহমান ইবনে যুবায়েরের স্ত্রী, কিন্তু তার পুরুষত্ব নেই। এজন্য আমি আমার প্রাক্তন স্বামীর সাথে আবার বিবাহ করতে চাই। তখন নবী করিম স. বললেন, না, তা পারবে না যতক্ষণ তুমি তোমার বর্তমান স্বামীর মধু পান করবে এবং সে পান করবে তোমার মধু।[১০]

তাবেয়ী ইকরিমা বলেছেন, পবিত্র কুরআনের সূরা বাকারার ২৩০ নম্বর আয়াতটি আয়েশা নামক একজন মহিলা সম্পর্কে নাযিল হয়েছে। তাকে এ নির্দেশ দেয়া হয়েছে যে, তার বর্তমান স্বামীর সঙ্গে যদি তার যৌনসঙ্গম হয়ে থাকে এবং সে যদি তাকে তালাক দেয় তবে পূর্বের স্বামীর সাথে পুনরায় বিবাহ হতে পারে। উপর্যুক্ত হাদীসের ব্যাখ্যায় আল্লামা আলুসী বলেন, কেবলমাত্র বিবাহ কিংবা যৌনসঙ্গম হলেই চলবে না তাদেরকে স্বামী স্ত্রীর মত স্বাভাবিক জীবন যাপন করতে হবে। এক রাত বা সুনির্দিষ্ট কোন সময়ের জন্য বা চুক্তি ভিত্তিক বিবাহ হলে চলবে না। এমতাবস্থায় যদি

তার স্বামী কোন ধরনের চাপ প্রয়োগ করা ব্যতীত তাকে তালাক দেয় তবে সেক্ষেত্রে প্রথম স্বামীর নিকট যাওয়ার সুযোগ থাকবে।

বাংলাদেশের সমাজে সচরাচর আমরা দেখতে পাই, কোন ব্যক্তি রাগের মাথায় তার স্ত্রীকে একসাথে তিন তালাক দিল। পরক্ষণে অনুতাপ অনুশোচনা জাগল, ঘর সংসারের বিধ্বস্তরূপ দেখে ভীত হয়ে পড়ল, স্ত্রীর প্রতি দীর্ঘদিনের প্রেম ভালবাসার কথা মনে পড়লো। ছেলে মেয়েদের করুণ চাহনী দেখে ঘাবড়ে গেল। সুন্দর গোছানো সংসারের ভাঙ্গা চেহারা দেখে মন বিষণ্ন হয়ে গেল। এমতাবস্থায় পরিবারের সদস্য ও আত্মীয় স্বজনদের নিয়ে কোন এক ব্যক্তিকে দিয়ে বিবাহ পড়িয়ে দিল। একলা থাকতে দিল আবার ক্ষেত্রবিশেষে স্ত্রীকে আলাদা রেখে পরদিন অথবা নির্দিষ্ট সময় অতিবাহিত হওয়ার পর তার নিকট থেকে তালাক নিয়ে নিজেই আবার বিবাহ করল। এ পদ্ধতির অনুসরণকে হিলা (অপকৌশল) বলা হয়।

আমাদের সমাজে প্রচলিত ও প্রতিষ্ঠিত এ রীতিটি কুরআন ও হাদীস কর্তৃক স্বীকৃত ও সমর্থিত নয়, বরং এটি সম্পূর্ণরূপে মনগড়া নিজেদের প্রয়োজনে তৈরি করা পন্থা, যাকে ইসলামী শরীয়ত মোতাবেক এক জঘন্য পন্থা বলা যেতে পারে। এ বিয়েতে বিবাহকারী পুরুষ লোকটি যেমন স্ত্রী লোকটিকে নিজের স্ত্রী ভাবতে পারে না, যদিও স্বামী বানিয়ে একরাতের জন্য তাকে অন্যের বিবাহ উপযোগী করার দায়িত্ব দেয়া হয়েছে ঠিক তেমনি মহিলাও অনুরূপই ভেবে থাকে। সুতরাং একরাতের এ দৈহিক মিলনের ব্যবস্থা রীতিমত চাপিয়ে দেয়া ব্যভিচার। এ কাজটি পরিষ্কার যেনা ব্যভিচারের অন্তর্ভুক্ত বলে ইসলামী স্কলারগণ মনে করেন। এ ধরনের নির্লজ্জ ও বেহায়াপনামূলক কাজ ইসলাম কোনভাবেই সমর্থন করে না। অথচ দুঃখজনক হলেও সত্য যে, শরীয়তের আইন সম্পর্কে অনভিজ্ঞ লোকদের হিলার নামে কুরআন ও হাদীসের ভুল ব্যাখ্যা দিয়ে এ কাজ করা আমাদের সমাজে এটি আজ রীতিতে পরিণত হয়েছে। বাংলাদেশের সমাজে সংগঠিত হাজার হাজার ঘটনাবলীর মধ্যে পূর্বল্লোখিত ঘটনা দু'টি উদাহরণ মাত্র।

ইসলামী শরীয়তে এ ধরনের বিবাহের অবস্থান

ইসলাম আল্লাহ প্রদত্ত জীবন বিধান। এটি মানুষের ধর্ম, মানবতার ধর্ম। মানুষের স্বভাবের সাথে সংগতিপূর্ণ। সমগ্র মানবজাতির জন্য প্রেরিত ইসলামে আল্লাহ মানবজাতির কল্যাণের বিধান দিয়েছেন। সে বিধান অবশ্য মানবীয় সৌকর্যের অন্তর্ভুক্তও বটে। অতএব ইসলামী শরীয়তে এ ধরনের বিবাহ সম্পূর্ণ হারাম এবং কবিরা গুনাহর নামান্তর। এ সম্পর্কে নিম্নের হাদীসসমূহ থেকে আমরা এর অভিশাপ বা নিষিদ্ধতা সম্পর্কে ধারণা লাভ করতে পারি।

১. হযরত আবু হোরায়রা রা থেকে বর্ণিত রসূল স. বলেছেন, আল্লাহর অভিশাপ তাদের ওপর যারা হিলা করায় এবং যার জন্য হিলা করানো হয়।[১১]

২. আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদ রা. থেকে বর্ণিত, রসূল স. অভিশাপ দিয়েছেন, যে হিলা করে এবং যার জন্য করা হয়।[১২]

৩. নবী করীম স.কে হালালকারী সম্পর্কে জিজ্ঞেস করা হলে তিনি বলেন, না এরূপ বিয়ে করা যাবে না। বিয়ে হবে শুধু তাই যা অনুষ্ঠিত হবে পারস্পরিক আগ্রহে, যাতে কোনরূপ ধোঁকাবাজি থাকবে না। আল্লাহর কিতাবের সাথে করা হবে না কোনরূপ ঠাট্টা বিদ্রূপপূর্ণ আচরণ। আর তার পরে পরস্পরে মধু মিলন হতে হবে।[১৩]

৪. উকবা ইবনে আমের রা. বর্ণনা করেছেন যে, রসূলুল্লাহ স. বলেছেন, আমি কি তোমাদের ভাড়া করা ষাঁড় সম্বন্ধে বলবো? সাহাবাগণ বললেন, অবশ্যই! রসূলুল্লাহ স. বললেন, আল্লাহর অভিশাপ তার ওপর যে হিলা করে, আর যার জন্য করা হয়।[১৪]

৫. ইবনে আবু শায়বা ও আবদুর রাজ্জাক প্রমুখ হযরত উমর রা. থেকে বর্ণনা করেন। তিনি বলেছেন, আমার কাছে এরূপ হালালকারী ও যার জন্য হালাল করা হয় উভয়কে আনা হলে আমি তাদেরকে পাথর মেরে হত্যা করব।[১৫]

৬. এক ব্যক্তি হযরত আবদুলাহ ইবনে উমারকে রা. জিজ্ঞাসা করলেন, আমি একটি মেয়েলোককে বিয়ে করেছি এ উদ্দেশ্যে যে, আমি তাকে তার স্বামীর জন্য হালাল করে দেব, সে আমাকে কিছুই আদেশ করেনি এবং কিছুই জানায়নি। এ সম্পর্কে আপনার অভিমত কি? জবাবে হযরত উমর রা. বললেন, না, এরূপ বিয়ে জায়েয নেই। বিয়ে শুধু তাই হবে, যা হবে ঐকান্তিক আগ্রহ সহকারে। তোমার পছন্দ হলে তাকে রেখে দেবে, আর পছন্দ না হলে তাকে আলাদা করে দেবে। যদিও এরূপ বিয়েকে রসূলুল্লাহ স. এর জামানায় সুস্পষ্ট যেনার মধ্যে গণ্য করা হত। এরূপ বিয়ের মাধ্যমে ২০ বছর দাম্পত্য জীবন যাপন করলেও তারা ব্যভিচারীই থেকে যাবে। যদি জানা যায় যে, তার উদ্দেশ্য ছিল অপরের জন্য হালাল করা।[১৬]

৭. হযরত ইবনে আব্বাস রা. কে জিজ্ঞেস করা হল, এক ব্যক্তি তার স্ত্রীকে তিন তালাক দিয়েছে। অতপর সে লজ্জিত ও অনুতপ্ত হয়েছে। তার সম্পর্কে আপনি কি বলবেন? জবাবে তিনি বললেন, সেই ব্যক্তি তো আল্লাহর নাফরমানী করেছে, এজন্য তিনি তাকে লজ্জিত করেছেন। সে শয়তানের আনুগত্য করেছে। ফলে তার জন্য মুক্তির আর পথ খোলা রাখা হয়নি।[১৭] উপরোক্ত হাদীসসমূহ থেকে পরিষ্কার হয়ে যায় আমাদের সমাজে প্রচলিত হিলা নামক ধোঁকাবাজি ও প্রতারণা ইসলামে নিষিদ্ধ। আবার একই সময়ে তিন তালাক দেয়াকে হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস রা. আল্লাহর নাফরমানির সাথে তুলনা করেছেন। রসূলুল্লাহ স. হিলাকারীদের ধার করা ষাঁড়ের সাথে তুলনা করেছেন এবং এ ধরনের বিবাহকে যেনার মধ্যে শামিল করেছেন।

আমাদের সমাজে প্রচলিত হিলা জঘন্য কাজ এবং এটি ব্যভিচারের মধ্যে শামিল। হাদীসের ভাষায় বিষয়গুলো অতীব স্পষ্ট হয়ে উঠায় এখানে আর বিশদ ব্যাখ্যা বিশ্লেষণের প্রয়োজন নেই।

তাহলীল সম্পর্কে ইমামগণের অভিমত

ইমাম মালেক, আহমাদ বিন হাম্বল, সুফিয়ান সাওরী, আহলে জাহের, হাসান বসরী, ইবরাহীম নাখয়ী, কাতাদা, লাইস, ইবনে মুবারক রা. প্রমুখের মতে হালাল করার জন্য বিয়ে করা হারাম এবং

এ বিয়ের মাধ্যমে স্ত্রী প্রথম স্বামীর জন্য হালাল হবে না। ইমাম শাফেয়ীর মতে তাহলীলের শর্ত না লাগানো হলে বিয়ে সহীহ হবে। ইমাম আবু হানিফা ও যুফারের মতে আকদ (বিয়ে সংগঠনের শর্তাবলী) এর মধ্যে তাহলীলের শর্ত লাগালে বিয়ে মাকরূহ তাহরীমি হবে (প্রায় হারাম), তবে প্রথম স্বামীর জন্য স্ত্রী হালাল হয়ে যাবে। দ্বিতীয় স্বামী তাকে তালাক দিলে বা মারা গেলে এ স্ত্রীকে প্রথম স্বামী বিয়ে করতে পারবে।

হানাফী মাজহাবের দু'জন বিশিষ্ট ইমামের মত

ইমাম আবু ইউসুফ র. বলেন, হালাল করার শর্তে বিয়ে করলে বিয়ে ফাসেদ হবে এবং এ বিয়ের মাধ্যমে স্ত্রী প্রথম স্বামীর জন্য হালাল হবে না। ইমাম মুহাম্মদ র. এর মতে, তাহলীলের শর্তারোপ করে বিয়ে করলে বিয়ে সহীহ হবে কিন্তু প্রথম স্বামীর জন্য (যার জন্য হালাল করার উদ্দেশ্যে বিয়ে করা হল) ঐ স্ত্রী হালাল হবে না। অর্থাৎ প্রথম স্বামী তাকে বিয়ে করতে পারবে না।[১৮]

তাহলীল বিয়ে সম্পর্কে যেহেতু আল্লাহর রসূল স. লানত করেছেন তাদের ধার করা ষাঁড় ও যেনাকারীর সাথে তুলনা করেছেন, অতএব এ বিয়ে কোনবস্থায়ই বৈধ নয়। আমাদের সমাজে হিলা বিয়ের প্রচলনের মাধ্যমে কুরআন হাদীস নিষিদ্ধ বস্তুর প্রচলনকে চালু রাখা ও এর মাধ্যমে অশ্লীলতার বন্যা প্রবাহিত করার সুযোগ সৃষ্টির মাধ্যমে একটি পঙ্কিলময় সমাজে পরিণত করতে দেয়া কোনভাবেই মেনে নেয়া যায় না।

সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ কথা এই যে, রাগের বশবর্তী হয়ে একত্রে তিন তালাক দানের পর যদি হিলা করার মাধ্যমে স্ত্রীকে ফিরে পাওয়া যায় তবে তালাক হয়ে যাবে একটি অতি মামুলী জিনিস। একাজ করতে কেউ পরোয়া করবে না। আর যদি এভাবে তালাক দিয়ে স্ত্রী ফিরে পাওয়া না যায়, তবে সবাই তালাকের কথা ভাবতে দশবার চিন্তা করবে।

তথ্যপঞ্জি

১. সূরা আল-বাকারা : ২২৯।

২. সূরা আল-বাকারা : ২৩০।

৩. বাংলাবাজার পত্রিকা, ০২ ডিসেম্বর ২০০০।

৪. আরবী শব্দ। স্বামী স্ত্রীকে তালাক দেয়ার পর স্ত্রীর যদি অন্যত্র বিয়ে হয়ে যায় এবং বর্তমান স্বামী যদি তালাক দেয় অথবা মৃত্যুবরণ করে তাহলে স্ত্রী প্রথম স্বামীর কাছে আবার বিবাহের মাধ্যমে ফিরে যেতে পারে। তালাক ও হিলা, বাংলাদেশ মহিলা আইনজীবী সমিতি, ঢাকা. পৃ. ৫৯।

৫. তালাক ও হিলা, পূর্বোক্ত, পৃ. ৫৯।

৬. প্রাগুক্ত।

৭. প্রথম আলো, ১৫ জানুয়ারি ২০০৩।

৮. তাফহীমুল কুরআন, সাইয়েদ আবুল আ'লা মওদূদী, টীকা, ২৫৩, পৃ. ২০১।

৯. পরিবার ও পারিবারিক জীবন, মাওলানা মুহাম্মাদ আবদুর রহীম, আধুনিক প্রকাশনী, বাংলাবাজার, ঢাকা, পৃ. ৩৮৯।

১০. প্রাগুক্ত পৃ. ৩৮৯।

১১. মুসনাদে আহমাদ।

১২. পূর্বোক্ত।

১৩. পরিবার ও পারিবারিক জীবন পূর্বোক্ত, পৃ. ৩৯০।

১৪. ইবনে মাজা

১৫. হাদীস, পরিবার ও পারিবারিক জীবন, পূর্বোক্ত, পৃ. ৩৯০।

১৬. প্রাগুক্ত, পৃ. ৩৯০।

১৭. প্রাগুক্ত, পৃ. ৩৯১।

১৮. ইসলামে তালাকের বিধান : নেকাহর গুরুত্ব : মাওলানা আব্দুল মান্নান, পরিচালক দারুল ইফতা, মগবাজার, ঢাকা।

ইসলামী আইন ও বিচার
জানুয়ারী-মার্চ ২০০৭
বর্ষ ৩, সংখ্যা ৯, পৃষ্ঠা : ৭৯-৮৯

নারীর পারিবারিক অধিকার প্রতিষ্ঠায় ইসলামের বিধান ও প্রচলিত আইন

নাহিদ ফেরদৌসী

সূচনা

মানবজাতি মহান আল্লাহ তাআলার একটি মর্যাদাবান সৃষ্টি। এ জাতিকে তিনি নারী ও পুরুষ এই দুই শ্রেণীতে বিভক্ত করে উভয়েরই মর্যাদা ও অধিকারের কথা তাঁর নবী স. এর মাধ্যমে জানিয়ে দিয়েছেন।

ইসলাম মানব জাতির জন্য একমাত্র পরিপূর্ণ জীবন ব্যবস্থা যা ব্যক্তি ও পরিবার থেকে রাষ্ট্রীয় জীবন পর্যন্ত সকল ক্ষেত্রে অনুসরণযোগ্য। আল্লাহ তাআলা যেসব হুকুম নাযিল করেছেন তার সবগুলোর সমষ্টি হলো শরীয়ত।[১] প্রত্যেক মানুষের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ স্তর হলো তার পারিবারিক জীবন। বাংলাদেশে নারীর পারিবারিক অধিকার সংরক্ষণের জন্য মুসলিম পারিবারিক আইন প্রণীত হয়েছে। মুসলিম পারিবারিক আইনের মূল উৎস হলো শরীয়া আইন। মুসলিম আইনের প্রতিটি ক্ষেত্রে শরীয়ার প্রয়োগ ও প্রভাব সীমাহীন। শরীয়া আইনের মূল ভিত্তি পবিত্র কুরআন, হাদীস বা সুন্নাহ। পবিত্র করআনে প্রায় দুইশত আয়াতে মুসলিম আইনের সাধারণ নীতিমালার বর্ণনা রয়েছে। সূরা বাকারা, আন-নিসা, আলে-ইমরান, আল-মায়েদা, আন-নূর প্রভৃতি সূরায় উত্তরাধিকার, বিবাহ, তালাক, দেনমোহর, ভরণ-পোষণ, হেবা, ইয়াতীমের মাল রক্ষণাবেক্ষণ ইত্যাদি সম্পর্কিত আইন লিপিবদ্ধ আছে।

শরীয়া আইন বিভিন্নভাবে বিবর্তিত হয়ে মুসলিম পারিবারিক আইনে রূপ লাভ করেছে। তবে সময়ের সাথে নতুন আইন পাশ করে মুসলিম পারিবারিক আইনের সংশোধন, সংযোজন ও পরিবর্ধন করা হয়েছে। কাজেই বর্তমানে বাংলাদেশে প্রচলিত মুসলিম পারিবারিক আইন পারিবারিক শরীয়া আইন থেকে কিছু ক্ষেত্রে বিচ্যুত হয়েছে।[২]

বাংলাদেশের সংবিধানে সমঅধিকার নিশ্চিত করা সত্ত্বেও পারিবারিক আইনের মাধ্যমে নারীর প্রতি সমঅধিকার ভঙ্গ হচ্ছে; পরিবারে ও সমাজে বিভিন্নভাবে নির্যাতিত হচ্ছে নারীরা। এর স্থায়ী সমাধানে ইসলামী বিধানের সুষ্ঠু প্রয়োগ নারীর পারিবারিক অধিকার প্রতিষ্ঠার কার্যকারী ভূমিকা রাখতে পারে। নারী সমাজের সুষ্ঠু উন্নয়ন ব্যতীত সুষ্ঠু সমাজ গঠন করা যায় না।[৩] একমাত্র

লেখিকা : সহকারী অধ্যাপক, স্কুল অব ল', বাংলাদেশ উন্মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয়।

ইসলামই নারী ও পুরুষকে একে অপরের সম্পূরক ও সহযোগী হিসাবে তাদের মর্যাদা ও অধিকার সংরক্ষণ করেছে।

পারিবারিক জীবনে নারীর সমঅধিকার ও মর্যাদা প্রতিষ্ঠায় ইসলামের বিধান

ইসলামপূর্ব যুগে মানুষের মধ্যে ধর্ম, নীতিবোধ, আদর্শ, ন্যায়পরায়ণতা ইত্যাদি ছিল না। মহিলাদের পারিবারিক ও সামাজিক অবস্থা ছিল শোচনীয়। তাদের কোন অধিকার কিংবা সামাজিক মর্যাদাই ছিল না।[৪]

কিন্তু সর্বশেষ নবী হযরত মুহাম্মদ স. আল্লাহ্ তাআলার নির্দেশে পবিত্র কুরআন মোতাবেক একটি ইসলামী সমাজ গঠন করেছিলেন যেখানে নারী ও পুরুষ উভয়ের মর্যাদা ও অধিকার প্রতিষ্ঠিত হয়।[৫]

ইসলামই নারীদেরকে সর্বপ্রথম পুরুষের সমান মর্যাদার স্বীকৃতি দেয়। ইসলাম পরিবারে ও সমাজে অবহেলিত, নির্যাতিত ও অধিকার বঞ্চিত নারীদের সকল প্রকার অধিকার নিশ্চিত করার লক্ষে বিবিধ পদক্ষেপ গ্রহণ করে যাতে নারী তার নারীত্বের বিকাশ ঘটাতে পারে এবং পরিবার, সমাজ ও রাষ্ট্রে পূর্ণ সম্মান নিয়ে অবদান রাখতে পারে।[৬]

আল্লাহ তাআলা পবিত্র কুরআনে বলেন, 'হে মানব! তোমরা তোমাদের প্রতিপালককে ভয় করো, যিনি তোমাদেরকে এক ব্যক্তি হতেই সৃষ্টি করেছেন এবং যিনি তা হতে তার সঙ্গীনিকে সৃষ্টি করেন। যিনি তাদের দু'জন হতে বহু নর-নারী পৃথিবীতে বিস্তার ঘটান এবং আল্লাহকে ভয় করো যাঁর নামে তোমরা একে অপরের নিকট প্রত্যাশা কর এবং ভয় করো জাতি বন্ধন ছিন্ন করাকে। আল্লাহ তোমাদের উপর তীক্ষ্ণ দৃষ্টি রাখেন।'[৭]

নারীদের অবস্থানকে আরও সুস্পষ্ট করে পবিত্র কুরআনে বলা হয়েছে, 'আর মুমিন পুরুষ ও মুমিন নারী একে অপরের পৃষ্ঠপোষক'।[৮]

আল্লাহ্ তাআলা আরও বলেন, 'তারা (নারী) তোমাদের পরিচ্ছদ এবং তোমরা (পুরুষ) তাদের পরিচ্ছদ স্বরূপ।'[৯] ইসলামে নারীর যে মর্যাদা ও অধিকার দিয়েছে তা আর কোন মতবাদ বা মতাদর্শই দিতে সক্ষম হয়নি। ইসলাম কন্যা, স্ত্রী, মা ও ভাগ্নি হিসাবে নারীর অবস্থানগত মর্যাদা ও অধিকার সুদৃঢ়তার সাথে প্রতিষ্ঠা করে দিয়েছে।

মা হিসাবে নারীর অধিকার

মানুষের উপর সর্বাধিক অধিকার তার মাতা-পিতার। তবে ইসলামে মায়ের অধিকার বাবার অধিকারের চাইতেও অধিক।[১০]

ইসলাম সর্বক্ষেত্রে মায়ের সাথে সম্মানসূচক ব্যবহার ও সম্মানজনক ভরণপোষণের জন্য সন্তানের প্রতি নির্দেশ দিয়েছে। পবিত্র কুরআন ও হাদীস শরীফে এ সম্পর্কে একাধিক সুস্পষ্ট ঘোষণা রয়েছে।

পবিত্র কুরআনে আল্লাহ তাআলা বলেন, 'তোমার প্রভু নির্দেশ দিচ্ছেন, তোমরা আল্লাহ ছাড়া আর কারো ইবাদত করবে না এবং মা-বাবার সাথে সদ্ব্যবহার করবে। তোমার উপস্থিতিতে তাদের কেউ অথবা দুজনই বৃদ্ধাবস্থায় উপনীত হলে তাদেরকে তোমার কথা দ্বারা কষ্ট দিবে না এবং তাঁদেরকে ভর্ৎসনা করবে না, বরং তাদের সাথে সম্মানসূচক ব্যবহার করবে। তাদের জন্য বিনয় ও নম্রতা সহকারে শ্রদ্ধার বাহু প্রসারিত করবে এবং আল্লাহর কাছে বলবে, প্রভু! আপনি তাদের প্রতি সদয় হোন যেভাবে তারা আমার শিশুকাল থেকে দয়ার সাথে আমাকে প্রতিপালন করেছেন।'[১১]

হযরত আবু হুরায়রা রা. বলেন, 'এক ব্যক্তি রসূলুল্লাহ সা. কে জিজ্ঞেস করলেন, হে আল্লাহর রসূল! আমার ভালো ব্যবহার পাবার সর্বাধিক অধিকারী কে? তিনি বললেন, তোমার মা। লোকটি জিজ্ঞেস করলেন, তারপর কে? তিনি জবাব দিলেন তোমার মা। লোকটি জানতে চাইলো, তারপর কে? তিনি বললেন, তোমার মা। লোকটি আবারও জানতে চাইলো, এরপর কে? তিনি বললেন, তোমার বাবা, অতঃপর ক্রমাগত নিকট আত্মীয়গণ।'[১২]

এই হাদীসে মায়ের স্থান বাবার তিনগুণ উর্ধ্বে বলে প্রমাণিত হয়েছে। কারণ মা সন্তানকে গর্ভে ধারণ ও জন্ম দেয়ার কষ্টের পর দুই বছর দুধ পান করান। পবিত্র কুরআনেও এই তিন কষ্টের বর্ণনা আছে।

পবিত্র কুরআনে বলা হয়েছে– 'আমি মানুষকে তার মা-বাবার প্রতি সদয় ব্যবহারের নির্দেশ দিয়েছি। তার মা তাকে গর্ভে ধারণ করে কষ্টের সাথে এবং প্রসব করে কষ্টের সাথে তাকে গর্ভে ধারণ করতে ও তার স্তন্য ছাড়াতে লাগে ত্রিশ মাস।'[১৩]

নবী স. বলেন, 'নিশ্চয় মায়েদের পদতলে জান্নাত'।[১৪]

তিনি আরো বলেন, 'মা অমুসলিম হলেও তার সাথে উত্তম আচরণ করবে।'[১৫]

কন্যা হিসেবে নারীর অধিকার

ইসলাম-পূর্ব যুগে কন্যা শিশুদের বেঁচে থাকার অধিকার ছিল না। সেকালে লোকেরা কন্যা সন্তানকে পরিবারের বোঝা মনে করতো। এবং জন্মের পর পরই জীবন্ত পুঁতে ফেলে অথবা পাহাড় থেকে নীচে ফেলে দিয়ে হত্যা করতো।[১৬]

পবিত্র কুরআনে এ সম্পর্কে বলা হয়েছে : 'ওদের কাউকে যখন কন্যা সন্তানের সুসংবাদ দেয়া হয় তখন তার মুখমণ্ডল কালো হয়ে যায় এবং সে অসহনীয় মনোকষ্টে লিপ্ত হয়। সে চিন্তা করে হীনতা সত্ত্বেও সে কন্যা সন্তানকে রেখে দিবে না মাটিতে পুঁতে দিবে। সাবধান! ওরা যা সিদ্ধান্ত করে তা কত নিকৃষ্ট।'[১৭]

জাহেলী যুগে প্রাচীন আরবে শিশু কন্যাদের সাথে যেরূপ নির্দয় ব্যবহার করা হতো সে সম্পর্কে এক ব্যক্তি নবী স. এর কাছে একটি ঘটনা বর্ণনা করেন।

তিনি বলেন : 'আমার একটি মেয়ে ছিল। সে আমাকে খুব ভালোবাসতো। তার নাম ধরে ডাকলে সে দৌড়ে আমার কাছে আসতো। একদিন আমি তাকে ডাকলাম। তাকে সঙ্গে করে নিয়ে হাঁটতে

লাগলাম। পথে একটি কূয়া পেলাম। তার হাত ধরে ধাক্কা দিয়ে কূয়ার মধ্যে ফেলে দিলাম। তার যে শেষ কথাটি আমার কানে ভেসে এসেছিল তা ছিল, হায় আব্বা! হায় আব্বা! একথা শুনে রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম কেঁদে ফেললেন। তাঁর চোখ দিয়ে অশ্রু ঝরতে লাগলো। উপস্থিত লোকদের মধ্য থেকে একজন বললেন : ওহে, তুমি রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে শোকার্ত করে দিয়েছো। তিনি বললেন : থাক, তোমরা একে বাধা দিয়ো না। যে বিষয়ে তার কঠিন অনুভূতি জেগেছে সে বিষয়ে তাকে প্রশ্ন করতে দাও। তারপর তিনি তাকে বললেন : তোমার ঘটনাটি আবার বর্ণনা করো। সেই ব্যক্তি আবার তা শুনালেন। ঘটনাটি আবার শুনে তিনি এত বেশি কাঁদতে থাকলেন যে, চোখের পানিতে তাঁর দাড়ি ভিজে গেলো। এবার তিনি বললেন, জাহেলী যুগে যা কিছু করা হয়েছে আল্লাহ তা মাফ করে দিয়েছেন। এখন নতুন করে জীবন শুরু করো।'[১৮]

নারীদের প্রতি এই অপমান ও জলুম ইসলাম মেনে নেয়নি। নারীর প্রতি ইসলাম কতখানি সম্মান প্রদর্শন করেছে তার নজীর পবিত্র কুরআন ও হাদীস শরীফে পাওয়া যায়।

আল্লাহ তাআলা পবিত্র কুরআনে বলেছেন : 'তোমাদের সন্তানদেরকে হত্যা করবে না। তোমাদেরকে এবং তাদেরকে আমিই রিযিক দিয়ে থাকি।'[১৯]

পবিত্র কুরআনে এ ধরনের নিকৃষ্ট কাজকে কঠোরভাবে নিষিদ্ধ করে বলা হয়েছে : 'আর যখন [কিয়ামতের দিন] জীবন্ত প্রোথিত কন্যাদের জিজ্ঞেস করা হবে, কোন অপরাধে তাদের হত্যা করা হয়েছিল?'[২০]

এ ধরনের সংকীর্ণ মানসিকতার সংশোধনকল্পে আল্লাহ তাআলা বলেন : 'তোমরা দারিদ্র্যের ভয়ে নিজ সন্তানদের হত্যা করো না। আমিই তাদের জীবিকা দান করবো আর তোমাদেরও। তাদের হত্যা করা নিসন্দেহে মহা অপরাধ।'[২১]

কন্যা সন্তান মাতা-পিতার জান্নাতে যাবার উসীলা

ইসলাম কন্যা সন্তান লালন পালনের এবং তাদের সাথে ভালো ব্যবহার করার নির্দেশ দিয়েছে। নবী স. বলেছেন, 'প্রথমে কন্যা সন্তান জন্মের মধ্যে মায়ের সৌভাগ্য নিহিত আছে।'[২২]

তিনি আরও বলেছেন, 'যে ব্যক্তি পূর্ণ বয়স্ক হওয়া পর্যন্ত দু'টি কন্যা সন্তান প্রতিপালিত করেছে, কিয়ামাতের দিন আমার ও তার মধ্যে কোন দূরত্ব থাকবে না। একথা বলে তিনি তাঁর আঙুলগুলোকে পরস্পরের সাথে মিশিয়ে দেখালেন।[২৩]

বস্তুত ইসলামে কন্যা সন্তানের গুরুত্ব ও প্রয়োজনীয়তা অপরিসীম। মেয়ে শিশু না চাওয়া মানে পৃথিবী ধ্বংস হওয়া। এভাবে ইসলামে কল্যাণরূপী কন্যা শিশুর প্রতি সম্মান প্রদর্শন করেছে এবং পৃথিবীতে বেঁচে থাকার অধিকারের পাশাপাশি শিক্ষাগ্রহণ বা জ্ঞানার্জন করা ও পারিবারিক সম্পত্তিতে কন্যা সন্তানদের অংশীদারিত্বের অধিকার দিয়েছে।

স্ত্রী হিসাবে নারীর অধিকার

ইসলামের আবির্ভাবের পূর্বে নারী জাতির প্রতি আরবদের বিতৃষ্ণা ছিল।[২৪] কিন্তু ইসলামে স্ত্রী হিসাবে নারীর সকল পারিবারিক মর্যাদা ও অধিকারের নিশ্চয়তা দেয়া হয়েছে; সংক্ষেপে এ বিষয়গুলো তুলে ধরা হল–

১. বিবাহের ক্ষেত্রে স্বাধীন মত প্রদানের অধিকার : ইসলাম-পূর্ব যুগে মেয়েদের পছন্দমত বিবাহ করার বা স্বামী বেছে নেয়ার কোন অধিকার স্বীকৃত ছিল না। একজন পুরুষ তার নিজের মা ছাড়া বাবার অন্য যে কোন স্ত্রীকে উত্তরাধিকার সূত্রে লাভ করতো এবং একজন বিধবার উপর তার স্বামীর আত্মীয়দের বেশি অধিকার ছিল।

ইসলাম নারীত্বের এই অবমাননা বন্ধ করার জন্য প্রতিবন্ধকতাযুক্ত বিবাহ নিষিদ্ধ করেছে এবং বিয়েকে দৃঢ় বন্ধনরূপে স্বীকৃতি দিয়েছে। এ উদ্দেশ্যে আল্লাহ তাআলা পবিত্র কুরআনে বলেছেন, 'তোমার পিতা যাকে বিবাহ করেছে তুমি তাকে বিবাহ করো না। আগে যা হবার তা হয়েছে। নিশ্চয় এটি লজ্জাজনক ও নিকৃষ্ট প্রথা।'[২৫]

কার কার সঙ্গে বিয়ের সম্পর্ক স্থাপন অনুচিত সে সম্পর্কে পবিত্র কুরআনে নির্দেশ আছে– 'তোমার মা, কন্যা, বোন, ফুফু, খালা ও ভাইয়ের কন্যারা, বোনের কন্যা, দুধ পান করিয়েছে যে মা, দুধের সম্পর্কে যে বোন, শাশুড়ী, তোমার দ্বারা পালিত এবং তোমার স্ত্রীর গর্ভে ভিন্ন ঔরসে জন্মগ্রহণ করা কন্যা, পুত্রবধু, দুই বোনকে একত্রে ইত্যাদির বিবাহ তোমার জন্য নিষিদ্ধ।'[২৬]

একইভাবে একজন মহিলাও ঐ সকল সম্পর্কের কোন পুরুষকে বিবাহ করতে পারবে না। এভাবে ইসলামে 'বিবাহ' একটি বিশেষ রূপ পেয়ে সামাজিক প্রতিষ্ঠানে পরিণত হয় এবং ইসলামী বিধান অনুযায়ী নিয়ন্ত্রিত হতে থাকে।[২৭] এই বিবাহ পদ্ধতির মাধ্যমে নারীর পারিবারিক ও সামাজিক সুরক্ষা নিশ্চিত হয়। একজন পুরুষ যেমন তার পছন্দ মতো নারীকে বিবাহ করতে পারে, তেমন নারীকেও তার পছন্দ মতো পুরুষকে বিবাহ করার অধিকার ইসলাম দিয়েছে।

২. বিবাহের ভিত্তিতে প্রাপ্য অন্যান্য অধিকার : বিবাহের মাধ্যমে নারী-পুরুষের অর্থাৎ স্বামী-স্ত্রীর পারস্পরিক কিছু কর্তব্য ও অধিকার জন্ম নেয়। যেমন স্ত্রী স্বামীর কাছ থেকে দেনমোহর ও ভরণপোষণ পাবার অধিকারী হয় এবং স্বামীর সম্পত্তির উত্তরাধিকারী হয়।

৩. নারীর যৌতুক বিহীন বিয়ের অধিকার : বিবাহের ব্যাপারে পণ বা যৌতুক প্রথা ইসলামে নিষিদ্ধ। এটি একটি সামাজিক কুপ্রথা। ইসলামী বিধান মতে বিয়ের প্রথম আর্থিক লেনদেন যা হয় তা হলো দেনমোহর; যৌতুক ইসলামী বিধান নয়।

কনের পরিবারের পক্ষ থেকে যৌতুক দিয়ে বিয়ে সাব্যস্ত করা কনের যোগ্যতা ও মর্যাদাকে ক্ষুণ্ন করার শামিল। ইসলামের দৃষ্টিতে বর-কনের মাঝে কেউ কারো চেয়ে বড়ো বা ছোট নয়। বর যেমন কনেকে পছন্দ করবে; কনেও তেমনি বরকে পছন্দ করবে। তারপর স্বেচ্ছা সম্মতির ভিত্তিতে বিবাহ হবে। ইসলামী আইনে যৌতুক নয় মোহরের মাধ্যমে নারীর আর্থিক নিরাপত্তা নিশ্চিত করা হয়েছে। এভাবে ইসলাম নারীর যৌতুক ছাড়া বিবাহের অধিকার প্রতিষ্ঠা করেছে।[২৮]

৪. নারীর দেনমোহরের অধিকার : নারীর জন্য মোহরানার বিধান ইসলামের একটি অনন্য অবদান। বিশ্বে অন্য কোন ধর্মে নারীর প্রতি এ রকম বাস্তব সম্মান দেয়নি। দরিদ্র বা ধনী সব পুরুষের জন্য স্ত্রীকে মোহরানা দিয়ে বিবাহ করা ইসলামের অপরিহার্য বিধান। পবিত্র কুরআনে দেনমোহরকে এক অর্থে 'আজর' (পুরস্কার বা প্রতিদান) বলা হয়েছে।[২৯] 'তোমরা তোমাদের স্ত্রীগণকে খুশি মনে মোহর প্রদান করো।'[৩০]

ইসলামে দেনমোহর স্বামীর ওপর আরোপিত দায় বা ঋণ যা অবশ্যই পরিশোধযোগ্য। নিম্নোক্ত হাদীস থেকে তা পরিশোধের গুরুত্ব অনুধাবন করা যায়। মহানবী স. বলেন, 'যে ব্যক্তি অল্প বা অধিক মোহর ধার্য করে বিবাহ করলো কিন্তু তা পরিশোধের ইচ্ছা তার নেই, সে ব্যভিচারী।[৩১] অর্থাৎ মোহরানা আদায় করার ব্যাপারে কোন প্রকার অনিহা গুরুতর অপরাধ। এভাবে দেনমোহর নারীর অধিকার প্রতিষ্ঠায় এক শক্তিশালী ব্যবস্থা।

৫. ভরণপোষণ পাওয়ার অধিকার : ইসলামে স্ত্রীর খোরপোষের (ভরণপোষণের) ব্যবস্থা করা স্বামীর প্রথম ও অবশ্য পালনীয় কর্তব্য। স্ত্রী হিসাবে নারী সর্বাবস্থায় স্বামীর কাছে ভরণপোষণ লাভের অধিকারী। স্ত্রী পর্যাপ্ত স্বচ্ছল হলেও তার এ অধিকার অটুট থাকে। স্বামী দরিদ্র হলেও স্ত্রীর এ অধিকার থেকেই যায়। মহান আল্লাহ বলেন : 'পুরুষগণ মহিলাদের রক্ষাকর্তা এবং ভরণপোষণ করবে কারণ আল্লাহ তাদের প্রত্যেকের রক্ষাকর্তা।'[৩২]

তবে স্বামীর মৃত্যুর সাথে সাথে স্ত্রী তার ভরণপোষণের অধিকার হারায়। তখন সে স্বামীর সম্পত্তির উত্তরাধিকারী হয়। কিন্তু ইসলামে বিবাহ বিচ্ছেদ হয়ে যাবার পর ভরণপোষণ দেবার শর্ত অসিদ্ধ। কারণ বিবাহ হলো একটি পারস্পরিক চুক্তি। এই বন্ধন অবসানের ফলে উভয়ের দায়িত্ব ও অধিকারেরও অবসান ঘটে।

৬. বিবাহ চুক্তি অবসানের (বিচ্ছেদের) অধিকার : ইসলামের বিধান অনুসারে যতদিন পর্যন্ত স্বামী-স্ত্রী যে কোন একজনের মৃত্যু না হবে ততদিন পর্যন্ত বিবাহ চুক্তি বহাল থাকবে। বিবাহ বন্ধন অটুট রাখার জন্য প্রয়োজনীয় সব ব্যবস্থা গ্রহণ করার জন্য পরামর্শ দেয়া হয়েছে। তবে যদি কখনও প্রতিভাত হয় যে, অপরিহার্য কোন কারণে বিবাহ বন্ধন বজায় রাখা অসম্ভব হয়ে পড়েছে সেক্ষেত্রে ইসলামী আইন বিবাহ বিচ্ছেদ অনুমোদন করেছে। ইসলামে এই বিচ্ছেদ বা তালাককে সবচেয়ে ঘৃণ্য বৈধ অনুমোদন হিসাবে অভিহিত করা হয়েছে।[৩৩]

পবিত্র কুরআনে বলা হয়েছে : 'এবং যদি তোমরা তাদের উভয়ের মধ্যে বিরোধ আশংকা করো, তবে তোমরা তার পরিবার থেকে একজন এবং ওর পরিবার থেকে একজন সালিশ নিযুক্ত করো। যদি তারা উভয়ে নিষ্পত্তি চায়। আল্লাহ তাদের মধ্যে মীমাংসার অনুকূল অবস্থা সৃষ্টি করবেন। আল্লাহ সর্বজ্ঞ, সবিশেষ অবহিত।'[৩৪]

ইসলামে নারীকে খোলার মাধ্যমে বিবাহ চুক্তির অবসান ঘটানোর এখতিয়ার দিয়েছে। আদালতে স্ত্রীর আবেদনের প্রেক্ষিতে বিচারক সার্বিক দিক বিবেচনা করে বিবাহ চুক্তি বাতিলের রায় প্রদান করবেন। এছাড়া স্বামী স্ত্রী উভয়ে বিবাহ বন্ধন মুক্ত হতে চাইলে তা 'মুবারাত' পদ্ধতিতে

পারস্পরিক সমঝোতার মাধ্যমেও হতে পারে। ইসলামে একজন বিবাহিত মহিলাকে একটি সম্পূর্ণ আইনানুগ সত্তা হিসাবে গণ্য করে এবং তার জন্য সকল প্রকার পারিবারিক অধিকার ভোগ করার ব্যবস্থা রেখেছে।

৭. সন্তানের অভিভাবকত্ব অধিকার : মা বাবার বিচ্ছিন্নতার কারণে বা উভয়ের মৃত্যু বা একের মৃত্যুতে অন্যজন পুনরায় বিয়ে করলে শিশু সন্তানদের অভিভাবকত্বের প্রসংগ আসে এবং এ বিষয়ে ইসলামে মা-ই হচ্ছেন তার শিশু সন্তানের তত্ত্বাবধানের বা হেফাজতের জন্য সবচেয়ে উত্তম অভিভাবক। মেয়ে সন্তান বয়ঃসন্ধিতে না পৌঁছা পর্যন্ত এবং ছেলে সন্তান সাত/আট বছর পূর্ণ না হওয়া পর্যন্ত মা তার তত্ত্বাবধানের অধিকারী। স্বামীর কাছ থেকে পৃথক অবস্থান করেন এ কারণে তিনি তার এই অধিকার হারান না। ইসলাম নির্দিষ্ট সময় পরেও সন্তানের কল্যাণের জন্য তাকে মায়ের তত্ত্বাবধানে রাখার নির্দেশ দিয়েছে; তবে শর্ত হলো, তিনি অসদাচরণের জন্য অভিযুক্ত নন।

৮. সম্পত্তিতে অধিকার : নারীর সম্পত্তি প্রাপ্তি ও ভোগের ক্ষেত্রে ইসলাম ধর্ম একটি পরিচ্ছন্ন উত্তরাধিকার আইন উপহার দিয়েছে।

নারীদের উত্তরাধিকার স্বত্ব পাওয়ার স্বীকৃতি দিয়ে পবিত্র কুরআনে বলা হয়েছে, 'পিতা-মাতা ও আত্মীয়-স্বজনের পরিত্যক্ত সম্পত্তিতে যেমন পুরুষের অংশ আছে তেমনি নারীরও অংশ আছে; তা অল্পই হোক অথবা বেশি হোক, তা এক নির্ধারিত অংশ।'[৩৫]

ইসলামে মৃত ব্যক্তির সম্পত্তি বণ্টনের ক্ষেত্রে অন্য সকল উত্তরাধিকারীদের মধ্যে প্রথম শ্রেণীর ওয়ারিশগণ অগ্রাধিকার পান এবং এদের সংখ্যা ১২ জন। এদের মধ্যে ৪ জন পুরুষ ও ৮ জন মহিলা। এরা হলেন স্ত্রী, মা, মাতার বা পিতার মা, কন্যা, পুত্রের কন্যা বা নিম্নগামী কেউ, সহোদর বোন, বৈমাত্রেয় বোন ও বৈপিত্রিয় বোন।

ইসলামের বিধান অনুযায়ী পিতার মৃত্যুর পর এক কন্যা ১/২ অংশ এবং একাধিক থাকলে সকলে মিলে ২/৩ অংশ পাবে যদি পুত্র সন্তান না থাকে। আর পুত্র সন্তান থাকলে কন্যা পুত্রের অর্ধেক পাবে।

মৃত ব্যক্তির সন্তান থাকলে মা ১/৬ অংশ পাবেন, সন্তান না থাকলে মা সম্পত্তির ১/৩ অংশের মালিক হবেন।

স্বামীর মৃত্যুর পর তার সন্তান থাকলে স্ত্রী তার পরিত্যক্ত সম্পদের ১/৮ অংশ এবং সন্তান না থাকলে ১/৪ অংশ পাবেন।

এছাড়া মৃত ব্যক্তি তার পরিত্যক্ত সম্পত্তিতে পুত্রের সমান বা সম্পূর্ণ সম্পত্তির উত্তরাধিকারী হিসাবে কন্যা বা কন্যাদের স্বত্ব প্রতিষ্ঠা করতে পারেন। এভাবে ইসলাম নারীদের স্বার্থ রক্ষায় বিশেষ বিধান প্রবর্তন করেছে।

৯. পারিবারিক জীবনে অর্থনৈতিক স্বাধীনতার অধিকার : ইসলাম নারীদের অর্থনৈতিক স্বাধীনতা ও অধিকার স্বীকার করে সকল নারীকে হালাল উপার্জন করার অধিকার দিয়েছে এবং তারা পুরুষের মতো সম্পত্তি অর্জন হস্তান্তর এবং ভোগ করতে পারেন। একজন নারী ইসলামে নিম্নোক্ত সূত্রে

সম্পত্তির মালিক হতে পারেন :
o মুসলিম উত্তরাধিকার সূত্রে
o বিয়ের দেনমোহর হিসাবে এবং
o দান সূত্রে (মুসলিম আইন মোতাবেক)
o উইল বা অছিয়ত সূত্রে, হেবা সূত্রে, ব্যবসা পরিচালনা বা সম্পত্তি বিনিয়োগ সূত্রে।

প্রচলিত পারিবারিক আইনে নারীর অধিকার

ভারত উপমহাদেশে বৃটিশ শাসনামলে মুসলিম পারিবারিক আইনের প্রবর্তন হয়। তখন থেকে সর্বপ্রথম মুসলমানদের উপর শুধু মুসলিম ব্যক্তিগত আইন প্রয়োগ করা হয়। অর্থাৎ উত্তরাধিকার, বিবাহ, তালাক, উইল, হেবা, ওয়াকফ সংক্রান্ত বিষয়গুলোতে মুসলিম আইন প্রয়োগ করা হয়।[৩৬] পাকিস্তান আমলে আরো কিছু মুসলিম পারিবারিক আইন বিধিবদ্ধ করা হয়। পরবর্তীতে বাংলাদেশ সৃষ্টির পর তৎকালীন পাকিস্তানের প্রচলিত পারিবারিক আইনগুলো খুব একটা পরিবর্তন করা হয়নি। শুধু নারীর পারিবারিক স্বার্থ সংশ্লিষ্ট বিষয় সুরক্ষার জন্য পারিবারিক আইনগুলোতে সংশোধন ও পরিবর্তন আনা হয়েছে। শুধুমাত্র মুসলমান নারীর জন্য যে সকল মুসলিম পারিবারিক আইন বিধিবদ্ধ করা হয়েছে তা হলো–

১. মুসলমান ওয়াক্ফ বৈধকরণ আইন, ১৯১৩
(Mussalman Wakf validiating Act, 1913)
২. শরীয়ত আইন, ১৯৩৭
(Shariat Act, 1937)
৩. মুসলিম বিবাহ বিচ্ছেদ আইন ১৯৩৯
(The Dissolution of Muslim Marraiage Act, 1939)
৪. মুসলিম পারিবারিক আইন অধ্যাদেশ, ১৯৬১
(Miuslim Family Laues Ordinance, 1961)
৫. মুসলিম বিবাহ এবং তালাক রেজিস্ট্রেশন আইন, ১৯৭৪
(Muslim Marriages and Divorce (Registration) Act, 1974)

এছাড়াও পারিবারিক বিষয়ে দেশে বিধিবদ্ধ কিছু আইন প্রয়োগ করা হয় যা মুসলমানসহ অন্য ধর্মের সকলের জন্য প্রযোজ্য।

১. জন্ম, মৃত্যু এবং বিবাহ রেজিস্ট্রেশন আইন, ১৮৮৬
(The Births, Deaths and Marriage Registration Act, 1886)
২. অভিভাবকত্ব ও তত্ত্বাবধায়ক আইন, ১৮৯০,
(The Guardians and wards Act, 1890)
৩. বাল্য বিবাহ নিরোধ আইন, ১৯২৯
(The child Marriage Restraint Act, 1929)

৪. যৌতুক নিরোধ আইন, ১৯৮০
(The Dowry prohibition Act, 1980)
৫. পারিবারিক আদালত অধ্যাদেশ, ১৯৮৫
(The Family Courts Ordinance 1985)
মুসলিম পারিবারিক জীবনের অনেকটাই এসব আইন নিয়ন্ত্রণ করে। ভারতের শরীয়া আইন ১৯৩৭ মতে মুসলিম পারিবারিক ও ব্যক্তিগত আইনের ক্ষেত্রে বিবাহ, তালাক, ইলা, জিহার, লিয়ান, খুলা এবং মুবারাত প্রতিপালন। তাছাড়া দেনমোহর, অভিভাবকত্ব, দান, ট্রাস্ট, ওয়াকফ ইত্যাদি শরীয়া আইনের আওতাধীন।[৩৭]

যদিও যৌতুক বিষয়টি মুসলিম পারিবারিক আইনের আওতাভুক্ত নয়; তথাপি এই সমস্যাটি পারিবারিক ক্ষেত্রে প্রকট। যৌতুক বাংলাদেশে শাস্তিযোগ্য অপরাধ হওয়ার পরও বিয়ের সাথে যৌতুকের একটি অনাকাঙ্ক্ষিত যোগসূত্র রয়ে গেছে। ১৯৮০ সালে যৌতুক নিরোধ আইন এবং ১৯৮৩ সালে নারী নির্যাতন (নিবর্তক শাস্তি) আইন প্রণীত হয়।

নারীর পারিবারিক সকল সমস্যা নিষ্পত্তির লক্ষে ১৯৮৫ সালে পারিবারিক আদালত আইন ও ১৯৮৯ সালে তার বিধিমালার প্রচলন হয়। পরবর্তীতে এটিকে অধিকতর ফলপ্রসূ করার জন্য ২০০০ সাল থেকে ADR পদ্ধতি (Alternative Disputes resolution) বা বিকল্প বিরোধ নিষ্পত্তির মাধ্যমে পারিবারিক আদালতের বিচারিক কার্যক্রমে নতুন গতির সঞ্চার করেছে। নারীর পারিবারিক অধিকার রক্ষার্থে বাংলাদেশে প্রচলিত মুসলিম পারিবারিক আইন সময়ের দাবিতে শরীয়া আইন থেকে যে পরিমাণ বিচ্যুত হয়েছে তা নারীকে যথার্থ নিরাপত্তা বা অধিকার দিচ্ছে কিনা তা ভাবার বিষয়।

আমরা জানি, পারিবারিক আইনের আওতায় রয়েছে– মুসলিম ব্যক্তিগত আইন এবং এই ব্যক্তিগত আইনের পরিপূরক হিসাবে বিভিন্ন সময়ে দেওয়ানী ও ফৌজদারী আইন প্রণীত হয়েছে।

পারিবারিক আইনের বর্তমান প্রেক্ষাপট বা সামাজিক বাস্তবতা

স্বাধীনতার ৩৬ বছরে বাংলাদেশে নারীর আইনগত অধিকার প্রতিষ্ঠায় পারিবারিক ক্ষেত্রে কার্যকর মুসলিম আইন রয়েছে অনেকগুলো। যদিও এসব আইন যুগোপযোগী ও সহজতর করার জন্য বেশ কয়েকবার সংশোধন করা হয়েছে কিন্তু প্রয়োগের ক্ষেত্রে এসব আইনে অনেক জটিলতা ও আইনগত সমস্যা দেখা দেয়।[৩৮]

এক : বিবাহ সংক্রান্ত আইনে নানা ধরনের স্ববিরোধিতা বিদ্যমান। যেমন ১৯২৯ সালের বাল্য বিবাহ নিরোধ আইন (১৯৮৪ সালে সংশোধিত) অনুযায়ী ১৮ বছরের নীচে কোন মেয়ে এবং ২১ বছরের কম বয়সী কোন ছেলের মধ্যে বিবাহ চুক্তি সম্পাদিত হলে তা আইনগতভাবে দণ্ডনীয় কিন্তু বিবাহ বৈধ হবে। তাতে দেখা যাচ্ছে, একটি বৈধ কাজ করার কারণে শাস্তি দেয়া হচ্ছে। অথচ শরীয়তে বৈধ কাজ করলে শাস্তির বিধান নেই।

দুই : ১৯৬১ সালের মুসলিম পারিবারিক আইন অধ্যাদেশ ও ১৯৭৪ সালের মুসলিম বিবাহ ও তালাক আইনে বিবাহ অবশ্যই রেজিস্ট্রেশন করতে হবে। তবে রেজিস্ট্রি না হলেও বিবাহ অবৈধ হবে না, কিন্তু আইনত দণ্ডনীয় হবে। এ ধরনের অসম্পূর্ণ বিধানের কারণে প্রাপ্য অধিকার লংঘিত হচ্ছে। কারণ বিয়ে রেজিস্ট্রি না হলে বিয়ে বিচ্ছেদের পর স্ত্রীর দেনমোহর নিয়ে সমস্যায় পড়তে হয়।

তিন : ১৯৬১ সালের মুসলিম পারিবারিক আইন অধ্যাদেশে বহু বিবাহ নিষিদ্ধ করা হয়নি কিন্তু আইনগত ব্যবস্থার মাধ্যমে শর্তযুক্ত করা হয়েছে। এমনকি কোন কোন পুরুষ শুধু যৌতুক লাভের জন্যও একাধিক বিবাহ করে। এ রকম সামাজিক প্রেক্ষাপটে নারীরা পারিবারিক অধিকার ভোগে ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছে।

চার : ইসলামী আইনে নারীর উত্তরাধিকার স্বত্ব লাভের স্বীকৃতি থাকলেও বিয়ের পর তার যে সম্পত্তি আইনগতভাবে প্রাপ্য সেই সম্পত্তি সামাজিক ও পারিবারিকভাবে সে তা পায় না। সম্পত্তির ভাগ আনতে গেলে সে বাপের বাড়িতে অপাংতেয় গণ্য হয়।

পাঁচ : ১৯৮৫ সালের পারিবারিক আদালতে বিবাহ-বিচ্ছেদ, দাম্পত্য অধিকার পুনরুদ্ধার, মোহরানা, খোরপোষ ও শিশুদের অভিভাবকত্ব ও তত্ত্বাবধায়ন এই পাঁচটি বিষয়ক বিরোধের নিষ্পত্তি হয় কিন্তু এই আইনটি ১৯৬১ সালের মুসলিম পারিবারিক অধ্যাদেশের বিধান সাপেক্ষ। মূলত নারী ও পুরুষের মাঝে অবস্থানগত যে ব্যাপক বাস্তব অসমতা রয়েছে তার জন্য নারীর পারিবারিক অধিকার সুরক্ষা সম্ভব হচ্ছে না।

উপসংহার : ইসলাম ধর্মে মানুষ হিসেবে নারী পুরুষের সম অধিকার স্বীকৃত হয়েছে বহু শতাব্দী পূর্বে। ইসলামী বিধান মতে পরিচালিত একটি পরিবার থেকে নারী তার সকল অধিকার ভোগ করতে পারে। নারীর পারিবারিক অধিকার রক্ষার জন্য বিভিন্ন সময়ে মানব রচিত বহু আইন বিধিবদ্ধ হলেও ইসলাম পরিপন্থী সমাজ ও নৈতিকতা বর্জিত চিন্তা নারী-পুরুষকে নিরাপত্তাহীন পরিবেশের মধ্যে ফেলে দিচ্ছে। কিন্তু ইসলামের বিধান যা সম্পূর্ণ ত্রুটিমুক্ত ও সত্য, সে মোতাবেক ন্যায়নীতির আলোকে পরিবার ও সমাজের সংস্কার না করতে পারলে সমাজের অস্থিরতা, নিরাপত্তাহীনতা ও অনিশ্চয়তা দূর করা যাবে না। ইসলামের বিধানের সঠিক প্রয়োগের ধারাবাহিকতায় পরিবার ও সমাজে নারীরা তাদের অধিকার ও স্বাধীনতার পথ খুঁজে নিতে পারে। বর্তমান আধুনিক যুগেও ইসলামী জীবন বিধান নারীর সকল পারিবারিক বৈষম্যরোধে সবচেয়ে বেশি কার্যকর ভূমিকা রাখতে সক্ষম হবে।

গ্রন্থপঞ্জি

১. 'ইসলামী আইন'– মূল: আসফ এ এ ফৈযী, অনুবাদ: গাজী শামছুর রহমান, ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, দ্বিতীয় সংস্করণ, ১৯৮৫ পৃষ্ঠা ৬৩।

২. 'পারিবারিক আইনে বাংলাদেশের নারী'– আইন ও সালিশ কেন্দ্র কর্তৃক প্রকাশিত গবেষণা পুস্তক, প্রকাশকাল ১৯৯৭, পৃষ্ঠা ১৩।

৩. 'ইসলাম প্রসঙ্গ'– ডক্টর মুহম্মদ শহীদুল্লাহ, মওলা ব্রাদার্স, প্রকাশকাল ২০০০, ঢাকা, পৃষ্ঠা ৩৩।

৪. 'ইসলামের ইতিহাস'– কে আলী, আলী পাবলিকেশন, ঢাকা, দ্বাদশ সংস্করণ ১৯৯০, পৃষ্ঠা ২১।

৫. 'মদীনা' মাসিক পত্রিকা, সীরাতুন্নবী স. সংখ্যা ১৪২৬ হিজরী, পৃষ্ঠা ৯০।
৬. 'নির্যাতন ও নারীর প্রতি বৈষম্যরোধে ইসলামী বিধান'– গাজী ওমর ফারুক এবং খন্দকার এ.বি.এম. কবির উদ্দিন, দি ইসলামিক ইউনিভার্সিটি স্টাডিজ, ২:২ (জুন ২০০১) আইন ও মুসলিম বিধান বিভাগ, ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয় কুষ্টিয়া, পৃষ্ঠা ১৯১।
৭. সূরা আন-নিসা ১।
৮. সূরা আত-তওবা ৭১।
৯. সূরা আল-বাকারা ১৮৭।
১০. 'ইসলাম আপনার কাছে কি চায়?'– মূল: সাইয়েদ হামেদ আলী, অনুবাদঃ আবদুস শহীদ নাসিম, সাইয়েদ আবুল আ'লা মওদূদী রিসার্চ একাডেমী, ঢাকা, দ্বিতীয় প্রকাশ ১৯৯৭ পৃষ্ঠা ৫৩।
১১. সূরা ইস্রা ২৩-২৪।
১২. বুখারী, মুসলিম।
১৩. সূরা আহকাফ, আয়াত ১৫।
১৪. আহ্মাদ ও নাসায়ী হাদীসের অংশ।
১৫. তিরমিযী।
১৬. 'ইসলামে নারী ও শিশু প্রসঙ্গ'– গাজী শামছুর রহমান, ই.পা.বা. প্রথম সংস্করণ ১৯৯০, পৃষ্ঠা ১৪।
১৭. সূরা আল-নাহল, আয়াত ৫৮-৫৯।
১৮. সূরা আত-তাকবীর আয়াত ৮-এর ব্যাখ্যা। (তাফহীমুল কুরআন ১৯ খণ্ড)
১৯. সূরা আল আন-আম ১৬১।
২০. সূরা আত তাকবীর ৮-৯।
২১. সূরা বনি ইসরাইল ৩১।
২২. বুখারী ও মুসলিম।
২৩. মুসলিম।
২৪. 'দি স্পিরিট অব ইসলাম' সৈয়দ আমীর আলী। নতুন সংস্করণ ১৯৯৫, মল্লিক ব্রাদার্স, কলকাতা, পৃষ্ঠা ৩২২।
২৫. সূরা আন-নিসা ৮।
২৬. সূরা আন-নিসা ৯।
২৭. 'বাংলাদেশে পারিবারিক আইন ও তার প্রয়োগ'। বাংলাদেশ জাতীয় মহিলা আইনজীবী সমিতি কর্তৃক প্রকাশিত গবেষণা পুস্তক, প্রকাশকাল ১৯৮৭, পৃষ্ঠা ৪৫।
২৮. 'ইসলাম শান্তি ও কল্যাণের ধর্ম' ড. হাবিবা খাতুন আ. আ. প্রকাশন। প্রথম প্রকাশ ২০০৪, পৃষ্ঠা ৫৫।
২৯. 'ইসলামে নারী ও শিশু প্রসঙ্গ' গাজী শামছুর রহমান, ই.পা.বা. প্রথম সংস্করণ ১৯৯০, পৃষ্ঠা ২৮।
৩০. সূরা আন-নিসা ৪।
৩১. বুখারী/ তিরমিজী।
৩২. সূরা আন-নিসা ৩৭।
৩৩. 'Human Rights in Islam' Parveen Sawkat Ali, Adam Publishers of Distributors India 1995, P-113.
৩৪. সূরা আন-নিসা ৩৫।
৩৫. সূরা আন-নিসা ৭ ও ১১।
৩৬. 'মুসলিম আইন' নূরুল মোমেন, বাংলা একাডেমী ঢাকা, প্রকাশকাল ১৯৯৪, পৃষ্ঠা ৫৫।
৩৭. 'শরিয়া আইন ও ইসলাম' সা'দ উল্লাহ অনন্যা, বাংলাবাজার, ঢাকা, প্রকাশ ২০০১, পৃষ্ঠা ১৯১।
৩৮. 'মুসলিম আইন ও পারিবারিক আদালত' সাহিদা বেগম, বাংলা একাডেমী, দ্বিতীয় সংস্করণ ২০০২, পৃষ্ঠা ১২২।

ইসলামী আইন ও বিচার
জানুয়ারী-মার্চ ২০০৭
বর্ষ ৩, সংখ্যা ৯, পৃষ্ঠা : ৯০-১০১

আকযিয়াতুর রসূল স.

ইমাম মুহাম্মদ ইবনুল ফারাজ আল আন্দালুসী

॥ চার ॥

গ্রন্থকার মুহাম্মদ ইবনুল ফারাজ আল আন্দালুসী ওরফে ইবনে তুল্লা'র সমকাল

বিগত কিস্তিতে আমরা চতুর্থ ও পঞ্চম হিজরী শতাব্দির প্রথমার্ধে আন্দালুস রাজনৈতিক অস্থিরতা ও গৃহযুদ্ধের কারণে যে মারাত্মক বিপর্যয়ের শিকার হয়েছিল এর কিঞ্চিত বর্ণনা দিয়েছি। কিন্তু পঞ্চম হিজরী শতাব্দির দ্বিতীয়ার্ধের শুরুতে ইউসুফ বিন তাশফীন যখন বিবদমান সকল ক্ষমতালিপ্সু ছোট ছোট শাসকদের পরাজিত করে আন্দালুসে পুনর্বার এককেন্দ্রিক শাসন প্রতিষ্ঠা করেন, তখন আন্দালুসে ফিরে আসে স্থিতাবস্থা। কিন্তু রাজনৈতিক এই অস্থিরতা আন্দালুসের শিক্ষা ও জ্ঞানের জগতকে মোটেও প্রভাবিত করতে পারেননি। জ্ঞান বিজ্ঞানের চর্চা ও অগ্রগতি রাজনৈতিক অস্থিরতাকে পাশ কাটিয়ে আপন লক্ষপানে এগিয়ে চলে। ইবনে তুল্লা'র সময়ের কিছু কাল আগেই আন্দালুস জ্ঞানের শীর্ষ শিখরে পৌছে যায়। সেসময় দর্শন, যুক্তিবিদ্যা ও জ্যোতির্বিজ্ঞান সম্পর্কিত বিভিন্ন পুস্তকা অন্যান্য ভাষা থেকে আরবীতে অনূদিত হতে শুরু করে। সেই সময়কার শীর্ষস্থানীয় বিদ্যান ও গবেষক লেখকদের চিন্তা গবেষণা ও রচনাবলী সত্যিই অনন্য। বস্তুত ইবনে তুল্লা'র সময়টি ছিল অন্য সময়ের চেয়ে জ্ঞান চর্চার দিক দিয়ে বেশি অগ্রসর। তখন পূর্ব দিকে বাগদাদ আর পশ্চিমে কর্ডোভা ছিল সারা পৃথিবীর অন্যান্য শহরের তুলনায় শিল্প সংস্কৃতি জ্ঞান বিজ্ঞানে সবচেয়ে অগ্রসর। অতীতের কোন সময়ই এর সাথে তুলনীয় নয়।

পূর্ববর্তী উলামায়ে কেরাম ইলম ও জ্ঞানের যে উত্তরাধিকার রেখে গেছেন, ইমাম ইবনে তুল্লা' এ থেকে খুবই উপকৃত হয়েছেন।

ইবনে তুল্লা' সরাসরি যে আলেমদের কাছ থেকে জ্ঞান আহরণ করেছেন, বিশেষ করে তাফসীর, হাদীস, ফিকাহ, উসূল, মানতিক, তারিখ, আদব, লুগাত ইত্যাদি বিষয়ে যাদের কাছে পাঠ নিয়েছেন, তাদের নাম আমরা ইতিহাসের পাতায় পড়ি বটে কিন্তু সরাসরি তাদের লেখা পুস্তকাদি আজ আর আমাদের নাগালের মধ্যে নেই।

আমরা আগেই বলেছি, কর্ডোভা তথা স্পেনের ইসলাম বিদ্বেষী খৃস্টান শাসক গোষ্ঠী ইসলামী কিতাবপত্র নিশ্চিহ্ন করার ক্ষেত্রে এতোটাই উগ্র ছিলো যে, লক্ষ লক্ষ কিতাবাদি তারা জ্বালিয়ে ভস্ম করে ফেলে। এ থেকেও আন্দাজ করা যায় তাতারীরা বাগদাদে কি পরিমাণ ধ্বংসযজ্ঞ চালিয়ে ছিল।

ইবনে তুল্লা'র বংশ পরিক্রমা

আবু আব্দুল্লাহ মুহাম্মদ ইবনুল ফারাজ ইবনে তুল্লা'। ইবনে তুল্লা' নামে খ্যাতি লাভ করেন। তাঁর পিতা ফারাজ মুহাম্মদ ইবনে ইয়াহইয়া আলবাকরী এর মুক্ত করা গোলাম ছিলেন। এজন্য তাঁকে তুল্লা' বলা হয়। কেন আল বাকরীকে তুল্লা' নামে ডাকা হতো তা জানা সম্ভব হয়নি।

আন্দালুসীয় ঐতিহাসিক সূত্রগুলোতে অনুসন্ধান করে জানা যায়, ইবনে তুল্লা' কোন উল্লেখ করার মতো শিক্ষিত ও জ্ঞানচর্চায় লিপ্ত বংশের লোক ছিলেন না। তার পিতা ফারাজ কিংবা ফারাজের মুক্তিদাতা মুনীবও কোন ইলমী ঘরানার লোক ছিলেন না। তাই বলা চলে ইমাম ইবনে তুল্লা'র যশ খ্যাতি তার কোন বংশ খান্দানের প্রভাবে অর্জিত নয়। তাঁর খ্যাতি ও যশ তার অসাধারণ মেধা, যোগ্যতা ও ইলমের প্রতি তাঁর নিবেদিত প্রাণ হওয়ার ফসল। এছাড়া ইবনে তুল্লা'র খ্যাতি ও যশ একথাও প্রমাণ করে, ইসলাম কাউকে বংশমর্যাদার ভিত্তিতে মূল্যায়ন করে না, ইসলামে মর্যাদা ও সম্মানের ভিত্তি বংশ কৌলিন্য নয়, ইলম ও তাকওয়া।

মহান আল্লাহ তাআলা বলেন, 'তোমাদের মধ্যে যারা ঈমান এনেছে এবং যাদেরকে জ্ঞানদান করা হয়েছে, তাদেরকে আল্লাহ তাআলা মর্যাদায় উন্নীত করবেন। তোমরা যা করো, এ সম্পর্কে আল্লাহ সবিশেষ অবহিত।' (সূরা মুজাদালাহ, আয়াত ১১)

অপর এক আয়াতে আল্লাহ তাআলা বলেন, হে মানুষ! আমি তোমাদেরকে একজন পুরুষ ও একজন নারী থেকে সৃষ্টি করেছি। অতপর তোমাদেরকে বিভক্ত করেছি বিভিন্ন জাতি ও গোত্রে, যাতে তোমরা একে অপরের সাথে পরিচিত হতে পারো। তোমাদের মধ্যে আল্লাহর কাছে সেই ব্যক্তি বেশি মর্যাদা সম্পন্ন, যে তোমাদের মধ্যে বেশি মুত্তাকী। নিশ্চয় আল্লাহ সকল কিছু জানেন এবং সবকিছুর খবর রাখেন। (সূরা হুজরাত, আয়াত ১৩)

রসূল স. এ প্রসঙ্গে বলেন, যার জ্ঞান তাকে পিছনে ফেলে দেয় তার বংশ মর্যাদা তাকে সামনে অগ্রসর করতে পারে না। (মুসনাদে আহমদ)

জন্ম : ঐতিহাসিকগণের মধ্যে ইবনে তুল্লা'র জন্ম তারিখ ও জন্মস্থানের ব্যাপারে কোন মতানৈক্য নেই। তিনি ৪০৪ হিজরী সনে কর্ডোভায় জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর শৈশবের ব্যাপারে শুধু এতটুকু জানা যায় তিনি কুরআন হিফয করেন। অবশ্য শৈশবে কুরআন হিফয করার কারণ সম্পর্কে অনেকেই বলেন, সেসময় কর্ডোভার রীতিই এমন ছিল যে, শৈশবে সর্বাগ্রে শিশুদেরকে কুরআন শরীফ হিফয (মুখস্ত) করানো হতো।

ইবনে খালদুন তাঁর রচিত ইতিহাস গ্রন্থের একুশতম পরিচ্ছেদে বলেন, শৈশবে শিশুদেরকে কুরআন কারীম শেখানো দীনের আবশ্যিক রীতি। কমবেশি মুসলিম বিশ্বের সব জায়গাতেই এটা করা হয়ে থাকে। কেননা কুরআন হাদীসের শিক্ষার দ্বারা শিশুদের মনের মধ্যে ইসলামের আদর্শ বদ্ধমূল হয়। বিভিন্ন মুসলিম দেশে কুরআন শরীফই শিশুদের শিক্ষার প্রথম ধাপ। আন্দালুসের ইতিহাস সম্পর্কে যতটুকু জানা যায়, তাতে দেখা যায়, তারা কুরআন শিক্ষার মাধ্যমেই শিশুদের শিক্ষাজীবনের সূচনা করতেন। (মুকাদ্দিমা ইবনে খালদুন, পৃষ্ঠা ৫৩৮)

কুরআন কারীম হিফয করার পর ইবনে তুল্লা' আন্দালুসীয় আলেমদের কাছে মালেকী ফিকাহ পড়তে শুরু করেন। কারণ আন্দালুসের প্রশাসন তখন মালেকী ফিকাহ অনুসরণ করতো। সামাজিকভাবেও আন্দালুসে মালেকী ফিকাহর ব্যাপক প্রচলন ছিল।

ইমাম ইবনে হাযম র. বলেন, যে দু'টি মাযহাব শাসক শ্রেণী ও প্রভাবশালীদের পৃষ্ঠপোষকতায় প্রতিষ্ঠা লাভ করে তন্মধ্যে একটি হলো মালেকী মাযহাব আর অপরটি হানাফী মাযহাব। মালেকী মাযহাব আন্দালুসে সরকারি পৃষ্ঠপোষকতায় ব্যাপ্তি লাভ করে এবং হানাফী মাযহাব শাসকদের পৃষ্ঠপোষকতায় মধ্য ও দক্ষিণ এশিয়ায় ব্যাপকতা লাভ করে। (নাফহুত্তীব-খণ্ড-২ পৃষ্ঠা ২১৮)

সরকারি ও সামাজিক প্রচলনের কারণে স্বাভাবিকভাবেই ইবনে তুল্লা' সর্বাগ্রে মালেকী মাযহাবের মূলনীতি ও খুঁটিনাটি সম্পর্কে দক্ষতা অর্জনের প্রতি মনোনিবেশ করেন।

উস্তাদ ও নির্দেশকবৃন্দ

ইবনে তুল্লা' তার সময়ের বিপুল সংখ্যক আলেমদের কাছ থেকে শিক্ষা দীক্ষা লাভ করেন। সবার তালিকা এখানে উল্লেখ করা খুবই কঠিন। তন্মধ্যে মৃত্যুসনের পরিক্রমা অনুযায়ী কয়েকজনে নাম উল্লেখ করা হলো।

১. হাসান ইবনে আইউব ইবনে মুহাম্মদ ইবনে আইউব আনসারী। হাদ্দাদ নামে সমধিক পরিচিত। মৃত্যু ৪২৫ হিঃ। তিনি হাদীস ও লুগাত সম্পর্কে বিখ্যাত পণ্ডিত ছিলেন। যে কোন সমস্যা সম্পর্কে তাঁর মতামত খুবই গুরুত্ব বহন করতো। (আস্সিলাহ, পৃষ্ঠা ৪৭)

২. ইউনুস ইবন আব্দুল্লাহ ইবনে মুহাম্মদ ইবনে মুগীছ। মৃত্যু ৪২৯ হিঃ। তিনি ছিলেন কর্ডোভার প্রখ্যাত মুহাদ্দিস, ফকীহ ও কাজী। ইবাদত ও যুহদ (-------) সম্পর্কে তিনি কয়েকটি গ্রন্থ রচনা করেন। ইমাম ইবনে তুল্লা' তাঁর কাছ থেকেও শিক্ষাগ্রহণ করেন। (বাগিয়াতুল মুলতামিস, পৃষ্ঠা ৫১২, আস্সিলাহ পৃষ্ঠা ৬৮৪, আদদিবাজ পৃষ্ঠা ২৭৫, আলঈবরাজ খণ্ড ৩, পৃষ্ঠা ৩২৯, শাজারাতুয্যাহব খণ্ড ৩, পৃষ্ঠা ৪০৭)

৩. আহমদ ইবনে হিশাম ইবনে জাহুর। মৃত্যু ৪৩০ হিজরী। তিনি ছিলেন মুরশানায় জন্মগ্রহণকারী কিন্তু কর্ডোভায় বসবাস করতেন। অত্যন্ত বড় মাপের আলেম ছিলেন। ইবনে তুল্লা' তাঁর কাছেও শিক্ষাগ্রহণ করেন। (আদদিবাজ পৃষ্ঠা ২৭৫)

৪. মুহাম্মদ ইবনে আব্দুল্লাহ ইবনে সাদি ইবনে আবেদ আল আফেরী। মৃত্যু ৪৩০। তিনি খ্যাতিমান ফকীহ ও মুহাদ্দিস ছিলেন। বিখ্যাত মুহাদ্দিস ও ফকীহ আবু মুহাম্মদ আল আসাইলীর কাছ থেকে শিক্ষাগ্রহণকারীদের মধ্যে তিনি ছিলেন কর্ডোভায় বেঁচে থাকা সর্বশেষ ব্যক্তি। ইবনে তুল্লা' তাঁর কাছ থেকেও ইলম অর্জন করেন। (আসসিলাহ, পৃষ্ঠা ৬১)

৫. মাক্কী বিন আবী তালিব। তাঁর প্রকৃত নাম হামুস বিন মুহাম্মদ, ইবনে মুখতার আলকাইষী। ৬৩৭ হিজরীতে ইন্তেকাল করেন। কুরআন, আরবী লুগাত ও আরবী সাহিত্যের খ্যাতিমান আলেম ছিলেন। তিনি বহু উঁচু মানের কয়েকটি গ্রন্থ রচনা করেন।

৬. আহমদ ইবনে মুহাম্মদ ইবনে ঈসা ইবনে বিলাল। ইবনে কাত্তান হিসেবে বেশি পরিচিত। মৃত্যু ৪৬০ হিজরী। কর্ডোভায় সমকালীনদের মধ্যে প্রখর মেধা ও স্মৃতি শক্তির অধিকারী ছিলেন। ইলমের ক্ষেত্রে তিনি ছিলেন অদম্য। (আসসিলাহ, পৃষ্ঠা ৫৪৬)
৭. মুহাম্মদ ইবনে জাহুর ইবনে মুহাম্মদ জাহুর আল ওয়ালীদ। মৃত্যু ৪৬২ হিজরী। তিনি কুরআন করীমের প্রখ্যাত ক্বারী ও হাফেয হিসেবে খ্যাতিমান ছিলেন। তার জ্ঞানপিপাসা ছিল প্রবল। নতুন নতুন তথ্য ও ইলম অর্জনের জন্যে বিশেষজ্ঞদের শরণাপন্ন হওয়ার ব্যাপারে তাঁর বিশেষ সুনাম ছিল। (আসসিলাহ, পৃষ্ঠা ৬১৪, আল বাগিয়াহ, পৃষ্ঠা ৪৬১)
৮. হাতেম ইবনে মুহাম্মদ ইবনে আব্দুর রহমান। ইবনে তারালিসা নামে খ্যাতি লাভ করেন। মৃত্যু ৪৬৯ হিজরী। তিনি ফিকাহ শাস্ত্রের অনেক বড় মাপের আলেম ছিলেন। (আদদিবাজ ২৭৫, আসসিলাহ পৃষ্ঠা ৫৬৪, আলবাগিয়াহ, পৃষ্ঠা ২৭০)
৯. মুআবিয়া ইবনে মুহাম্মদ আল আফীলী আবু আব্দুর রহমান। মৃত্যু ৪৬৯ হিজরী। ইবনে বশকুল এই মনীষী সম্পর্কে বলেন, তিনি ছিলেন কুরআনের অনন্য হাফেয। অধিকাংশ সময় কুরআন তিলাওয়াতে মগ্ন থাকতেন। (আসসিলাহ, পৃষ্ঠা ৫৬৪)

ইবনে তুল্লা'র জ্ঞান ও প্রজ্ঞা

মালেকী ফিকহে ইবনে তুল্লা' ছিলেন সমকালীনদের মধ্যে অনন্য প্রজ্ঞার অধিকারী। এজন্য তাঁকে 'রিয়াসাতুল ইফতা' গ্র্যান্ড মুফতী বা প্রধান মুফতী পদে অধিষ্ঠিত করা হয়েছিল। জাতীয় ও সামাজিক যে কোন বিষয়ে তার মতামতকে খুবই গুরুত্ব দেয়া হতো। ইলম পিপাসুরা ইমাম মালিক সংকলিত 'মুআত্তা' ও 'মুদাওওয়ানা' শোনার জন্যে দূরদূরান্ত থেকে ইবনে তুল্লা'র কাছে এসে জড়ো হতেন। গোটা আন্দালুসিয়া জুড়ে তাঁর সমকক্ষ মালেকী মাযহাবের পুঙ্খানুপুঙ্খ ফিকাহ জানা ব্যক্তি আর কেউ ছিলেন না। তিনি দীর্ঘদিন বেঁচে ছিলেন। ফলে দাদা থেকে নাতি পর্যন্ত এমন তিন পুরুষের লোকজনও তার কাছে ইলম শিক্ষা করেছেন। কর্ডোভার প্রধান জামে মসজিদের খতীবের দায়িত্বও তিনি পালন করতেন। তিনি মসজিদের মিম্বরে বসে বক্তৃতা করতেন। জটিল জটিল ফিকহী সমস্যাকেও অত্যন্ত সহজ ভাষায় সবার অনুধাবন উপযোগী করে উপস্থাপন করতেন। তাঁর ভাষা ছিল প্রাঞ্জল এবং উপস্থাপন ভঙ্গি ও কণ্ঠ ছিল খুবই আকর্ষণীয়। শরীয়তের প্রতিটি আইন ও বিধানের রহস্য, মর্ম ও উদ্দেশ্য ব্যাখ্যার ক্ষেত্রে তিনি ছিলেন অসাধারণ দক্ষতার অধিকারী। 'আকযিয়াতুর রসূল' সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর গ্রন্থনা ও রচনা তাঁর সেই দক্ষতা ও দূরদর্শিতারই পরিচয় বহন করে। ইবনে তুল্লা'র শিক্ষকদের অনেকেই বলতেন, 'ইমাম মালিক র. যদি ইবনে তুল্লা'র সাক্ষাত পেতেন, তাহলে তিনি দারুণ খুশি হতেন। তাঁর চোখ জুড়িয়ে যেতো এই অসাধারণ মেধার অধিকারী অনুসারীকে দেখে।'

সমকালীন আলেমদের দৃষ্টিতে ইবনে তুল্লা'

ইবনে তুল্লা' কোন পর্যায়ের এবং কোন মানের আলেম ছিলেন, এ সম্পর্কে নিম্নে কয়েকজনের উক্তি উদ্ধৃত করা হলো :

ইবনে বশকুল র. বলেন, ইবনে তুল্লা' ছিলেন অনেক বড় মাপের আলেম ও ফকীহ। তিনি মালেকী ফিকহের হাফেয ছিলেন। ফাতওয়া দেয়ার ব্যাপারে বিশেষজ্ঞ ছিলেন। জটিল কোন বিষয়ের বুদ্ধিবৃত্তিক সমাধানের ক্ষেত্রে তাঁর পরামর্শ প্রাজ্ঞমহলে খুবই গুরুত্বপূর্ণ বিবেচিত হতো। যে কোন বিধানের দার্শনিক ভিত্তি মর্ম লক্ষ ও উদ্দেশ্য সম্পর্কে তার দূরদর্শিতা ছিল অসাধারণ। সমকালীন আলেমদের চিন্তা-ভাবনা সম্পর্কে তিনি যথাযথ খোঁজ-খবর রাখতেন। (আসসিলাহ, পৃষ্ঠা ৫৬৪)
ইবনে ফারহুন র. লিখেছেন, ইবনে তুল্লা'কে সমকালীন ফকীহদের মধ্যে শায়খুল ফুকাহা বলা হতো। সমকালীন আলেম ও ফকীহদের মধ্যে তিনি ছিলেন সবার চেয়ে বয়োজ্যেষ্ঠ। (আদদিবাজ, পৃষ্ঠা ২০৫)
আদদাববী বলেন, ইবনে তুল্লা' তাঁর যুগের শ্রেষ্ঠ ফকীহ ছিলেন। তিনি ছিলেন কর্ডোভার খ্যাতিমান মুহাদ্দিস। যে কোন পরামর্শে তাঁর মতামতকে সর্বাধিক গুরুত্ব দেয়া হতো। (বাগিয়াতুল মুলতামিস ২৩)
ইবনুল আম্মাদ বলেন, ইবনে তুল্লা'র মর্যাদা ছিল সমকালীন আলেমদের মধ্যে সর্বোচ্চ। তিনি অকপটে সত্য কথা বলতে দ্বিধা করতেন না। (শাজারাতুয্ যাহাব খণ্ড ৩, পৃষ্ঠা ৪০৭)
হাফেয যাহবী র. বলেন, ইবনে তুল্লা' আন্দালুসের সবচেয়ে বড় মুফতী ও আলেম ছিলেন। সমকালীন সকল আলেম ইলমী ব্যাপারে তার শরণাপন্ন হতেন। (আল-ঈর খণ্ড, ৩, পৃষ্ঠা ৩৪৯)
ইবনে বশকুল র. অপর এক জায়গায় বলেন, ইবনে তুল্লা' সবসময় আল্লাহর যিকির করতেন। তিনি ছিলেন কুরআনের হাফেয। বেশি বেশি কুরআন তিলাওয়াত করতেন। তাজবীদের প্রতি খুবই গুরুত্ব দিতেন। বেশি কুরআন তিলাওয়াতের কারণে তার তাকওয়ার মান বেড়ে গিয়েছিল। সত্য ও ন্যায়ের প্রশ্নে কারো সমালোচনার পরওয়া করতেন না। সকল ঐতিহাসিক ও জীবনীকারগণ বলেছেন, তিনি শাসকদের সামনে অকপটে সত্য ও হক কথা বলতে সামান্যতম দ্বিধা করতেন না।
ইবনে তুল্লা' সম্পর্কে একটি ঘটনা বর্ণিত আছে, একদিন কর্ডোভার শাসক মু'তামিদ বিন ইবাদ পথিমধ্যে তাঁর মুখোমুখি হন। ইবনে তুল্লা'র ইলমের সম্মান করে তিনি ঘোড়া থেকে নেমে কুশলাদি জিজ্ঞেস করেন। কিন্তু এরপরও সত্যনিষ্ঠ ইমাম শাসক মু'তামিদকে নাগরিকদের সাথে সৎব্যবহার ও ইনসাফের ব্যাপারে সতর্ক করা থেকে বিরত থাকেননি। তিনি মু'তামিদকে বলেন, 'সেই দিনের কথা মনে রেখো, যে দিন আল্লাহর সামনে দাঁড়িয়ে শাসন ক্ষমতা সম্পর্কে তোমাকে জবাবদিহি করতে হবে।' বিভিন্ন ঐতিহাসিকগণ এই ঘটনা সংক্ষিপ্তাকারে বর্ণনা করেছেন। (আলমাগরিব ফি হুলয়াল মাগরিব, খণ্ড ১, পৃষ্ঠা ১৬৫)
ইবনে ফারহুন লিখেছেন, ইমাম ইবনে তুল্লা' বিদআতের ব্যাপারে খুবই কঠোর এবং শাসকদের ব্যাপারে নির্ভিক ছিলেন। (আদদিবাজ, পৃষ্ঠা ২৭৫)

কিতাবের সূত্র ও উৎস

ইমাম ইবনে তুল্লা'র হাদীসের সর্বোৎকৃষ্ট উৎস সহীহ বুখারী, মুসলিম, মুআত্তা ইমাম মালিক, আবু দাউদ, সুনানে নাসাঈ ইত্যাদিতে বিশেষ বুৎপত্তি ছিল। এসব কিতাব থেকে তিনি সম্ভাব্য তথ্য

উপাত্ত সংগ্রহ করেছেন। অবশ্য এসব উৎসের অনেক তথ্য উপাত্ত তিনি পরিহারও করেছেন। অবশিষ্ট সূত্র উপাত্ত তিনি ফিকহের কিতাবাদি থেকে সংগ্রহ করেছেন। জামে তিরমিযি, সুনানে ইবনু মাজা, দারামী, দারে কুতনী, বায়হাকী ও মুসতাদরাকে হাকেম তার সময়ে বেশি প্রচলিত ছিল না। এজন্য বোধ হয় তিনি এসব কিতাব থেকে বেশি সূত্র উপাত্ত সংগ্রহ করেননি বা করতে পারেননি। প্রশ্ন হতে পারে তিনি ফিকহের কিতাব ইবনে আবী জায়েদের আন্‌নাওয়াদের, ইবনে হাবীবের 'আল ওয়াবিহা' ইবনু আল মুনযির এর আল-আশরাফ, উসাইলী এর 'আলফাওয়ায়েদ' ইত্যাদি কিতাব থেকে কেন হাদীস সংগ্রহ করেছেন? অথচ এসব হাদীস আবু দাউদ ও সুনানে নাসাঈতেই সংকলিত হয়েছে। আমি এই প্রশ্নের এই ব্যাখ্যা ছাড়া আর কোন ব্যাখ্যা পাইনি যে, হাদীসের তুলনায় তাঁর ফিকহের কিতাবাদির প্রতি বেশি ঝোঁক ছিল এবং ফিকহে তিনি বেশি অভিজ্ঞ ছিলেন।

কিতাব শেষে সূত্র বর্ণনা

এটা বলা খুবই প্রাসঙ্গিক হবে যে, ইসলামের ইতিহাসে ইমাম ইবনে তুল্লা'র আগে কোন গ্রন্থ রচনার শেষে সূত্র উল্লেখের রীতি ছিল না। এই রীতির প্রবক্তা ইমাম ইবনে তুল্লা'। তিনিই প্রথম গ্রন্থের শেষে গ্রন্থসূত্র উল্লেখ করেন। তাঁর যুগের আগে এমনকি তাঁর যুগেও কোন গ্রন্থ রচনায় তথ্যসূত্র উল্লেখ করার রীতি প্রচলিত ছিল না। আমরা যদি বলি যে কোন গ্রন্থ রচনায় তথ্য সূত্র উল্লেখের যে রীতি বর্তমানে চালু রয়েছে এর প্রবক্তা ইমাম ইবনে তুল্লা' তাহলে মোটেও অত্যুক্তি হবে না। অনেকেই এমন ধারণা পোষণ করেন যে, গ্রন্থ রচনায় তথ্যসূত্র উল্লেখ করার রীতি চালু করেছেন ওরিয়েন্টালিস্ট তথা প্রাচ্যবিদ্যা বিশারদ ইউরোপীয়। কিন্তু ইবনে তুল্লা'র উৎস বর্ণনার রীতি এই ভ্রান্ত বিশ্বাসের মূলোৎপাঠন করে। ইসলামের ইতিহাস যদি গভীরভাবে পাঠ করা হয় এবং অনুসন্ধান করা হয়, তাহলে এ বিষয়টি পরিষ্কার বোঝা যাবে যে, রচনায় তথ্য সূত্র উল্লেখ করার রীতি মুসলিম মনীষীগণ ইউরোপীয় প্রাচ্যবিদদের অনেক আগে থেকে শুরু করেছেন। এমনকি আগের যুগের একই কিতাবের হাতে লিখিত বিভিন্ন নুসখা বা সংস্করণের উপর তারা যে বিস্তর গবেষণা ও পর্যালোচনা করেছেন, সেগুলো এখনো মূল্যবান গবেষণার ভিত্তি হিসেবে আদৃত।

ইমাম ইবনে তুল্লা'র রচনাবলী

যোগ্যতা ও প্রজ্ঞার তুলনায় ইবনে তুল্লা'র রচনাবলীর সংখ্যা বেশি নয়। এর কারণ এও হতে পারে যে, তিনি ওয়াজ দরস তাদরিস ও ফাতওয়ার কাজে ব্যস্ত সময় কাটাতেন। ফলে গ্রন্থ রচনার জন্য সময় পেতেন না। তবে তাঁর রচিত 'আকযিয়াতুর রসূল' স. কিতাবটিই আমাদের কাছে তাঁর গ্রন্থ রচনার দক্ষতা ও গভীরতার উৎকৃষ্ট প্রমাণ।

কিতাব : আকযিয়াতুর রসূল

ইমাম ইবনে তুল্লা'র এই কিতাবটি কয়েকটি নামে পরিচিত। 'কাশফুয্‌যুনূন' গ্রন্থের লেখক ইবনে তুল্লা'র এই রচনাকে 'আকযিয়াতুর রসূল' স. নামে পরিচিত করিয়েছেন। অধিকাংশ পূর্ববর্তী ও

পরবর্তী উলামা এই নামেই এই কিতাবকে চিনেন। (শারহুল মাওয়াহিব, খণ্ড ৩ পৃষ্ঠা ৩৭০) ইবনে ফারহুন এই কিতাবের নাম উল্লেখ করেছেন, 'আহকামুন নবী' হিসেবে। (আদদিবাজ, পৃষ্ঠা ২৭৫) ইবনে বশকুল ও ইবনে খায়রও একই নামের উল্লেখ করেছেন। (দেখুন, আসসিলাহ, পৃষ্ঠা ৫৬৫ এবং ফিহরাসত পৃষ্ঠা ২৪৬) খতীবে বাগদাদী উল্লেখিত উভয় নামের উল্লেখ করে নাম দিয়েছেন, 'আহকামুন নবী স. 'কিতাবুল আকযিয়া'। (হাদিয়া আল আরেফীন, খণ্ড ২, পৃষ্ঠা ৭৮) কেউ কেউ এই কিতাবের নাম দিয়েছেন, 'নাওয়াবিলুল আহকাম আন নাববিয়া'। (আলমাগরিব ফি হালিলি মাগরিব খণ্ড ১ পৃষ্ঠা ১৬৫)

উল্লেখিত নামসমূহের সবকটিতেই কিতাবের বিষয়বস্তু সম্পর্কে অবহিত হওয়া যায়। এ ব্যাপারে কারো কোন দ্বিমত নেই যে, রসূল স. এর ফয়সালা ও বিচার নিয়েই গ্রন্থিত হয়েছে এ কিতাব। 'নাওয়াযিল' আহলে মাগরিব তথা মরক্কো, তিউনিসিয়া ও আলজেরিয়ার একটি পরিভাষা। এর বিপরীতে প্রাচ্যে তা ফাতওয়া অর্থে ব্যবহৃত হয়। অবশ্য নাওয়াযে বলা হয় যে কোন নতুন সমস্যা বিষয়ক সমাধানকে। এর বিপরীতে ফাতওয়া বলতে যে কোন শরয়ী প্রশ্ন ও সমস্যার সমাধানকে বোঝায়। সমস্যা বা প্রশ্নটি নতুন সৃষ্ট বিষয়ে হোক বা পুরনো সবক্ষেত্রেই ফাতওয়া শব্দ ব্যবহৃত হয়।

ইবনে তুল্লা'র নিম্নে বর্ণিত রচনাবলী সম্পর্কে আমরা অবহিত হতে পেরেছি :

১. কিতাবুশ শুরুত।

২. যাওয়ায়েদ আবী মুহাম্মদ ফিল মুখতাসার।

৩. মুখতাসার আবী মুহাম্মদ ফিল ওয়ালাআ।

৪. কিতাবুল ওছায়েক।

(দেখুন, আদদিবাজ, আলবাগিয়াহ, আল মাগরিব ফি হালিলি মাগরিব, খণ্ড ১, পৃষ্ঠা ১৬৫, ফিহরাসৃত, ইবনে খায়র)

মৃত্যু

ঐতিহাসিকগণ এ ব্যাপারে একমত যে, ৪৯৭ হিজরী সনের ১৩ রজব, বৃহস্পতিবার চাশতের সময় (দুপুরের আগে) ইমাম ইবনে তুল্লা' ইন্তেকাল করেন। এবং একই দিন আসরের নামাযের পর কর্ডোভার বিখ্যাত আল আব্বাস কবরস্তানে তাঁকে দাফন করা হয়। (দেখুন আসসিলাহ, আদদিবাজ, আলবাগিয়াহ, শাজরাতুয যাহব)

ইমাম ইবনে তুল্লা' বর্ণাঢ্য কর্মময় জীবন অতিবাহিত করেছেন। প্রশাসকদের কাছে তিনি ছিলেন গুরুত্বপূর্ণ উপদেষ্টা। দীনের হক দাওয়াত দিতে গিয়ে তাঁকে বহুবার শাসকদের বিরূপতার মুখোমুখি হতে হয়। বৈরি শাসকদের দ্বারা তিনি নিগৃহীতও হয়েছেন। সব বিরূপতা ও যাতনা তিনি অপরিমেয় ধৈর্য সহিষ্ণুতায় মোকাবেলা করেছেন। এবং আল্লাহর দরবারে এর প্রতিদান প্রত্যাশা করেছেন।

ইবনে ফারহুন লিখেছেন, ইবনে তুল্লা'র উস্তাদ ইবনে ফাত্তানের ইন্তেকালের পর দীনি ব্যাপারে ইবনে তুল্লা' কঠোর নীতি অবলম্বন করেন এবং তাঁর মতাদর্শকে কঠোরভাবে প্রয়োগ করতে শুরু করেন। মুরাবেতীনরা যখন কর্ডোভার শাসন ক্ষমতায় আসীন হয় তখন তারা ইবনে তুল্লা'কে প্রধান মুফতীর পদ থেকে সরিয়ে দেয়। কারণ মুরাবেতীনদের ব্যাপারে তিনি অনমনীয় মনোভাব পোষণ করতেন। এ সময় তিনি ইবাদতে মগ্ন থাকতেন। বরখাস্ত হওয়ার পর মৃত্যু পর্যন্ত আর কখনো তিনি প্রধান মুফতীর পদ গ্রহণ করেননি।

ইমাম ইবনে তুল্লা'র শাগরেদবৃন্দ

দীর্ঘ জীবন লাভ করার কারণে ইমাম ইবনে তুল্লা' বহু শাগরেদ রেখে গেছেন। তাদের অনেকেই বিভিন্ন বিষয়ে বিশেষজ্ঞ ও খ্যাতিমান ছিলেন। সবার বিস্তারিত বর্ণনা করতে হলে গ্রন্থের কলেবর বেড়ে যাবে। তাই অতি সংক্ষিপ্তাকারে তাঁদের কয়েকজনের নামোল্লেখ করা হলো।

১. মুহাম্মদ বিন হায়দার বিন আহমদ বিন মানসুর বিন আবু বাকার। মৃত্যু ৫০৫ হিজরী। তিনি হাফেযে হাদীস ও আসমায়ে রিজাল সম্পর্কে অগাধ জ্ঞানের অধিকারী ছিলেন। ফকীহ আবু আব্দুল্লাহ মুহাম্মদ ইবনে ফারাজসহ অন্যান্য মনীষীবৃন্দের কাছ থেকেও তিনি ইলমী জ্ঞান আহরণ করেছেন। (আসসিলাহ, পৃষ্ঠা ৫৬৮)

২. আব্দুল আযীয ইবনে আব্দুল্লাহ ইবনে মুহাম্মদ ইবনে আহমদ ইবনে হাযমুন। মৃত্যু ৫০৬ হিজরী। তিনি ছিলেন দারুল ইফতার প্রধান, প্রশাসকদের উপদেষ্টা এবং বড় মাপের ফকীহ। (আসসিলাহ, পৃষ্ঠা ৩৭২/৩৭৩)

৩. হিশাম ইবনে আহমদ ইবনে আবুল ওয়ালীদ। মৃত্যু ৫০৯ হিজরী। তিনি ছিলেন কর্ডোভার প্রধান ধর্মনেতা এবং ফকীহ। সমকালীনদের মধ্যে তাঁকে শীর্ষ আলেম গণ্য করা হতো।

৪. আহমদ ইবনে ইবরাহীম ইবনে আহমদ ইবনে ইবরাহীম আবু জাফর। মৃত্যু ৫১১ হিজরী। তিনি কর্ডোভা জামে মসজিদের খতীব ছিলেন। আইন বিশেষজ্ঞগণ শরীয়তের যে কোন জটিল বিষয়ে তাঁর পরামর্শ নিতেন। (আসসিলাহ, পৃষ্ঠা ৭৪)

৫. ইয়াহইয়া ইবনে আমর ইবনে বাকা আল জুযামী। আবুবকর আলমারজুনী নামে খ্যাত ছিলেন। মৃত্যু ৫১১ হিজরী। ফিকহ শাস্ত্রে তার অগাধ ব্যুৎপত্তি ছিল। ব্যবসা বাণিজ্য ও এসব আইনের মারপ্যাচ সম্পর্কে তার বিশেষ পারদর্শিতা ছিল। (আসসিলাহ, পৃ. ৬৭২)

৬. আবু আলী হুসাইন ইবনে মুহাম্মদ হিউন বিন সিকরা আসসাদাফী। মৃত্যু ৫১৪ হিজরী। হাদীসের সত্য নির্ণয় ও সূত্র পরম্পরা সম্পর্কে তিনি বিশেষ পারদর্শী ছিলেন। ঐতিহাসিক ইবনুল আ'লা যখন তাঁর বিশিষ্ট শাগরেদদের সংখ্যা গণনা করেন তখন এই সংখ্যা ৩১৩তে পৌঁছে। এটা তাঁর ইলমী যোগ্যতার ব্যাপারে যথেষ্ট। (আসসিলাহ, পৃষ্ঠা ১৪৬, আফদিবাজ, পৃষ্ঠা ২৭৫)

৭. আব্দুর রহমান ইবনে মুহাম্মদ ইবনে আহমদ ইবনে মুখলিদ ইবনে আব্দুর রহমান ইবনে আহমদ ইবনে বাকী ইবনে মুখলিদ আবুল হাসান। মৃত্যু ৫১৫ হিজরী। তিনি দীর্ঘদিন কর্ডোভায় জজের

দায়িত্বে আসীন ছিলেন।
৮. আব্দুল জাব্বার ইবনে আব্দুল্লাহ ইবনে আহমদ ইবনে আসবাগ আলকুরাশী আল মারওয়ানী আবু তালিব। মৃত্যু ৫১৬ হিজরী। তিনি ছিলেন অস্বাভাবিক স্মৃতি শক্তির অধিকারী, তীক্ষ্ণধী ও বিচক্ষণ। ইতিহাসের উপর তাঁর রচিত কিতাবের নাম 'উয়ূনিল আমামাহ'। (আসসিলাহ, পৃষ্ঠা ৯৯)
৯. ইবরাহীম ইবনে মুহাম্মদ ইবনে খায়রা আবু ইসহাক। মৃত্যু ৫১৭ হিজরী, তিনি হাফেযে হাদীস ছিলেন। (আসসিলাহ, পৃষ্ঠা ৯৯)
১০. জারাহ বিন মূসা ইবনে আব্দুর রহমান আল আফেকী আবু উবায়দা। মৃত্যু ৫১৭ হিজরী। আদীব ও হাফেযে হাদীস ছিলেন। আরবী ভাষা, সাহিত্য ও বিশেষ করে গদ্য সাহিত্যে অসাধারণ ব্যুৎপত্তির অধিকারী ছিলেন। (আসসিলাহ, পৃষ্ঠা ১৩৪)

কিতাব সম্পর্কে কিছু আলোচনা

ইমাম ইবনে তুল্লা' প্রণীত মূল কিতাবের ভাষ্যকার অধ্যাপক ড. মুহাম্মদ জিয়াউর রহমান আযমী বলেন, আল্লাহর রহমতে উক্ত কিতাবের দুটি ছাপা সংস্করণ ছাড়াও হাতে লেখা তিনটি সংস্করণও আমি পেয়েছি। এসব কপি ও সংস্করণ সম্পর্কে কিছুটা আলোচনা আশা করি প্রাসঙ্গিক হবে।
১. সর্বপ্রথম এর একটি কপি মক্কার হারাম শরীফের ভেতরে সংরক্ষিত লাইব্রেরীতে আমি দেখতে পাই। কপিটির লাইব্রেরী নম্বর ছিল ৩১। এ কপিটিই ছিল সবচেয়ে প্রাচীন বিশুদ্ধ ও সম্পূর্ণ। পাঠকগণ এই কপিটি পাঠ করলে তাতে যে বাড়তি সংযোজনগুলো রয়েছে অন্যান্য কপি ও সংস্করণের সাথে তুলনা করলে তা বুঝতে পারবেন। এই কপিটির সাইজ ১৭ X ১২ ইঞ্চি। পৃষ্ঠা সংখ্যা ২৩২। প্রতিটি পৃষ্ঠায় পনেরোটি করে লাইন। হস্তলিপি খুবই সুন্দর ও পরিষ্কার। প্রথমদিকের কিছু অংশে স্বরচিহ্ন দেয়া আছে। কিন্তু শেষের দিকে স্বরচিহ্ন নেই। কিছু অংশে নুকতাও নেই। প্রথম এক তৃতীয়াংশের প্রতিটি বাক্যের শেষে একটি বৃত্তের ভেতরে যেমন (.) দেয়া। শেষ তৃতীয়াংশে বাক্যের শেষে শুধু আরবী হরফ (...) দেয়া। আবার কোন কোন বাক্যে বৃত্তের ভেতরে প্রথমাংশের মতো (.) দেয়া। এই কপিটি অষ্টম হিজরী শতকে লিখা। কিতাবটির শেষে লেখক (কাতেব) লিখেছেন, ৭২০ হিজরী সনের জুমাদাল উলা র. সাত দিন বাকী থাকতে এই কিতাব লেখার কাজ শেষ হয়। এর কাতেব আহমদ ইবনে আলী ইবনে মুহাম্মদ আস্‌সফী আল্লাহর রহমত প্রত্যাশী। কিতাবের প্রথম পৃষ্ঠায় বড় হরফে লেখা কিতাবের নাম 'আহকামে রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম' যার রচয়িতা বিখ্যাত ফকীহ ও উপদেষ্টা আবু আব্দুল্লাহ মুহাম্মদ ইবনে ফারাজ ইবনে তুল্লা' র.।
এই কপিটি লাইব্রেরীর সীলযুক্ত।
যেহেতু আমার অনুসন্ধান মতে এই কপিটিই সবচেয়ে পুরাতন এবং সেই সাথে এর মূল ইবারত ও টেক্সটও নির্ভরযোগ্য ও পূর্ণাঙ্গ তাই আমার গবেষণা কাজে এটিকেই আমি মূল ভিত্তি হিসেবে ধরেছি।

২. দ্বিতীয় কপিটির ফটোকপি আমি আরবলীগের কেন্দ্রীয় লাইব্রেরী থেকে সংগ্রহ করেছি। লাইব্রেরীর হাদীস বিভাগে ছিল এই কপি। এটির কার্ড নম্বর ৭৫। এই কপিটি ইস্তাম্বুলের শহীদ আলী পাশা লাইব্রেরী থেকে সংগৃহীত। সেখানে এই কিতাবের নম্বর উল্লেখিত হয়েছে ২-২১৬৮। সাইজ ৭.৮ X ২৭.২ ইঞ্চি। পৃষ্ঠা সংখ্যা ৫৭। প্রতিটি পৃষ্ঠার ৩২ লাইন। এই কপিটিও খুবই সুন্দর হাতের লেখা ও পরিচ্ছন্ন। এটিও অষ্টম হিজরী শতাব্দীর লেখা। কাতেব এটির শেষে লিখেছেন, ৭৩৫ হিজরী সনের রবিউল আউয়াল মাসের প্রথম দশকে এটির লেখার কাজ শেষ হয়েছে। শেষ পৃষ্ঠায় শহীদ আলী পাশা লাইব্রেরীর সীল রয়েছে।

৩. তৃতীয় কপিটির ফটোকপিও আমি আরবলীগের লাইব্রেরী থেকে সংগ্রহ করি। হাদীসের সংগ্রহশালায় এটির ক্রমিক নম্বর ৭৪। এর মূল কপি লালালী লাইব্রেরী ইস্তাম্বুল-এ ৪০০ ক্রমিক নম্বরে সংরক্ষিত রয়েছে। এটি যথেষ্ট বড় সাইজে ৬৭ পৃষ্ঠায় লেখা হয়েছে। কিতাবের প্রথম পৃষ্ঠায় এর নাম এভাবে উল্লেখ রয়েছে–

'কিতাবু আকযিয়াতুর রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম মিম্মাকাযা ফিহি আও আমারা বিল কাযা' অর্থাৎ 'রসূল স. এর বিচার : তিনি যেসব বিচার করেছেন কিংবা করার নির্দেশ দিয়েছেন'। রসূল স. এর বিচার বিষয়ক এসব বর্ণনা প্রখ্যাত মুহাদ্দিসীনে কেরাম ও ফকীহগণ করেছেন। এবং বিখ্যাত ফকীহ আবু আব্দুল্লাহ মুহাম্মদ ইবনে ফারাজ ইবনে তুল্লা কুরতবী র. এসব বর্ণনাকে সর্বজন গৃহীত হাদীসের গ্রন্থরাজী থেকে সংগ্রহ করেছেন। এই কিতাবের শেষে লাইব্রেরীর সীল রয়েছে। প্রতিটি পৃষ্ঠা ২২টি লাইনে লেখা। ৮১৫ হিজরী সনের ১৩ জুমাদাল উলা সোমবার কাতেব এ কপির লেখা শেষ করেন।

এই তিনটি কপি সংগ্রহের অনেক দিন পর আমি আরো দুটি কপির সংবাদ পাই। এর প্রথমটি কাতারে ছাপা হয়েছে। আলেপ্পো একটি কপি থেকে ফটোকপি করে এটি ছাপা হয়েছে। অপর কপিটিও আলেপ্পো থেকে সংগৃহীত কপিরই ফটোকপি। মূল কপিটি আলেপ্পোর 'দারুল ওয়াঈ' প্রকাশনা থেকে প্রকাশিত। এই দুটি কপির মধ্যে পার্থক্য শুধু এতটকু যে, দ্বিতীয় কপিটিতে ড. আব্দুল মু'তি কালআ'জী গ্রন্থকার ইবনে তুল্লা'র জীবনী সংযোজন করেছেন। কিতাবের শুরুতে কিছু শব্দের ব্যাখ্যা ও কিছু সংখ্যক বর্ণনাকারীর পরিচিতিও দেয়া হয়েছে। মূল (টেক্সট) বক্তব্য সম্পর্কে বলা যায়, আদি কিতাবের সাথে মিলিয়ে না দেখার কারণে এর মধ্যে অনেক ভুল ভ্রান্তি রয়ে গেছে।

এই কিতাব নিয়ে আমার গবেষণা কর্ম

১. প্রথমে আমি তিনটি হাতে লেখা সংস্করণ ও দুটি ছাপা কপির বৈশিষ্ট ও পার্থক্যগুলো গভীর মনোযোগ দিয়ে পড়ে চিহ্নিত করেছি। প্রত্যেকটি ছোটবড় পার্থক্য নির্ণয়ের চেষ্টা করেছি।

২. মূল গ্রন্থকার যেসব রেওয়ায়েত সংকলন করেছেন, আমি এগুলোর প্রত্যেকটির উৎস তালাশ করে যেগুলো পেয়েছি তার বস্তুনিষ্ঠতা যাচাই করেছি।

৩. যেসব অপ্রচলিত কিতাবের রেওয়ায়েত গ্রন্থকার সংকলন করেছেন, আমি সেগুলোর সত্যতা যাচাই করার জন্যে হাদীস, ফিকাহ, ইতিহাস ও সীরাতের কিতাব ঘেটে সেগুলোকে নির্ভরযোগ্য সূত্রের বরাতে শুদ্ধতা নির্ণয় করেছি।

৪. মূল কিতাবে যেসব বিখ্যাত মুহাদ্দিস, ফকীহ, ঐতিহাসিকগণের আলোচনা এসেছে, আমি তাদের সংক্ষিপ্ত পরিচিতি সংযোজন করেছি। এবং এসব পরিচিতির উৎসও উল্লেখ করেছি।

৫. মূল কিতাবে সংকলিত সকল হাদীসের সনদ আমি বাছাই করেছি। এ ব্যাপারে আমার পদ্ধতি নিম্নরূপ–

ক. যে হাদীসটি বুখারী ও মুসলিম শরীফে বর্ণিত হয়েছে, সেক্ষেত্রে আমি শুধু কিতাব ও বাব তথা অধ্যায় ও পরিচ্ছেদ উল্লেখ করেছি। অবশ্য এক্ষেত্রে আমি এও বলে দিয়েছি, বুখারীর ভাষ্যগ্রন্থ ফাতহুল বারীতে উল্লেখিত হাদীসটির নম্বর কত এবং মুসলিম শরীফের কত নম্বর পৃষ্ঠায় এটি সংকলিত হয়েছে।

খ. বুখারী ও মুসলিমের উভয়টিতে কিংবা এর কোন একটিতেও যে হাদীসের উল্লেখ নেই, সেক্ষেত্রে আমি হাদীসের সনদের ব্যাপারে খ্যাতিমান মুহাদ্দিসগণ কি বলেছেন, তা বিশদভাবে উল্লেখ করেছি। রাবীদের পরিচিতিও উল্লেখ করেছি। মুহাদ্দিসগণের পরিচিতিও উল্লেখ করেছি। হাদীসের সূত্র পরম্পরা সম্পর্কে তাঁরা যেসব পর্যালোচনা করেছেন, তাদের বক্তব্য অবিকৃতভাবে উপস্থাপন করেছি।

গ. যেসব হাদীসের সূত্র (সিকাহ) নির্ভরযোগ্য, সেগুলিকে আমি শুধু সিকাহ বলে শেষ করিনি। বলেছি এই হাদীসটি বুখারী মুসিলম শরীফে সংকলিত হয়েছে। এক্ষেত্রে আমি রাবীদের পরিচিতি দেয়া থেকে বিরত থেকেছি।

ঘ. যে হাদীসের উৎস ও সনদ সম্পর্কে কোন তথ্য পাওয়া যায়নি, এমন হাদীস সম্পর্কে আমি কোন মন্তব্য করিনি। এক্ষেত্রে আমি বলে দিয়েছি, হাদীসের উৎস জানা আমার পক্ষে সম্ভব হয়নি। হয়তো অন্য কেউ এই হাদীসের উৎস সম্পর্কে অবগত হতেও পারেন।

ঙ. এগুলোতে যাতে আরো গবেষণা চালানোর পথ সহজ হয় এজন্য সমালোচনার একটি চিত্র/ ছকও আমি দিয়ে দিয়েছি।

৬. অনেক ফিকহী ব্যাপার সহজবোধ্য করার জন্যে আমি হাশিয়ায় (ফুটনোটে) ফকীহদের দলীলাদি উল্লেখপূর্বক তুলনামূলক আলোচনা করেছি। আমার কাছে যখন কোন মত বেশি যৌক্তিক ও বাস্তব সম্মত মনে হয়েছে আমি সেটি বলে দিয়েছি। অন্যথায় শুধু দলীল প্রমাণ উল্লেখ করেই ক্ষান্ত হয়েছি।

৭. প্রতিটি কঠিন শব্দের ব্যাখ্যা করেছি এবং ফিকহী শব্দাবলীর আভিধানিক ও পারিভাষিক মর্মার্থ বর্ণনা করেছি।

৮. প্রতিটি আয়াতে সূরা ও আয়াত নম্বর উল্লেখ করেছি।

৯. যেসব হাদীস গ্রন্থকার সংক্ষিপ্তাকারে উল্লেখ করেছেন, আমি সেগুলোর পুরো মতন সংযোজন করেছি।

১০. অনেক জায়গায় আমি ইমাম আহমদ ইবনে হাম্বল র. এর মতামত উল্লেখ করেছি।

১১. বিরতি চিহ্নের কারণ বর্ণনা করেছি।

১২. গ্রন্থকার যেসব অপ্রচলিত কিতাব থেকে হাদীস সংকলন করেছেন, আমি সেসব কিতাবের পরিচিতি তুলে ধরেছি।

১৩. গ্রন্থকার রসূল স. এর যেসব ফয়সালার বর্ণনা উল্লেখ করেননি, আমি সম্পূরক পরিশিষ্ট অধ্যায়ে সেইসব ফয়সালার বর্ণনা সংযোজন করেছি।

আমার এই ভাষ্যকে সহজবোধ্য ও উপকারী করার জন্যে কিতাবের শেষে আমি তিনটি সূচি সংযোজন করেছি।

১. প্রথমে সেই সব রাবী ও ব্যক্তিবর্গের পরিচিতি দিয়েছি এই কিতাবে যাদের নাম বিভিন্ন বর্ণনায় এসেছে।

২. দ্বিতীয়ত মূলসূত্র ও উপাত্তের উৎসের নির্ঘন্ট।

৩. তৃতীয়তঃ কিতাবের সূচি।

মহান এই কিতাবটি যাতে অনুসন্ধিৎসু পাঠকবর্গের উপযোগী ও সহায়ক গ্রন্থরূপে পেশ করতে পারি, এজন্য মহান আল্লাহর দরবারে আমি তৌফিক কামনা করছি।

এ কিতাবের পাঠকবর্গ ও এই অধমের জন্য আমি আল্লাহর দরবারে হিদায়াতের আবেদন করছি এবং আমার এই প্রয়াসকে আল্লাহর কাছে মকবুল হওয়ার দুআ করছি।

ওয়াসাল্লাল্লাহু তাআলা আলা সাইয়্যেদানা মুহাম্মাদিউ ওয়া আ'লা আলিহী ওয়া আসহাবিহী আজমাঈন।

মূল গ্রন্থকার সম্পর্কে ড. মুহাম্মদ জিয়াউর রহমান আজমী (হাদীস বিভাগ, ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়, মদীনা মোনাওয়ারা, সৌদি আরব) এ নিবন্ধটি রচনা করেছেন।

অনুবাদ : আবু শিফা মুহাম্মদ শহীদ

ইসলামী আইন ও বিচার
জানুয়ারী-মার্চ ২০০৭
বর্ষ ৩, সংখ্যা ৯, পৃষ্ঠা : ১০২-১০৩

আল কুরআনে মধ্যস্থতার বিধান : (Arbitration)

মুঃ শওকত আলী

১. আর যদি ঈমানদার লোকদের মধ্য হতে দুটি দল পরস্পর লড়াইয়ে লিপ্ত হয়ে পড়ে, তাহলে তাদের মধ্যে সন্ধি করে দাও। পরে যদি তাদের মধ্য হতে একটি দল অন্য দলের প্রতি বাড়াবাড়ি ও সীমালংঘনমূলক আচরণ করে তাহলে সীমালংঘনকারী দলটির সাথে লড়াই কর। যতক্ষণ না সে দলটি আল্লাহর নির্দেশের কাছে ফিরে আসে। অতপর যদি ফিরে আসে তাহলে তাদের মাঝে সুবিচার সহকারে সন্ধি করে দাও। আর ইনসাফ কর। আল্লাহতো ইনসাফকারী লোকদেরকে পছন্দ করেন।
২. মুমিনরাতো পরস্পরের ভাই অতএব তোমাদের ভাইদের পারস্পরিক সম্পর্ক পুনর্গঠন করে দাও। আর আল্লাহকে ভয় কর। খুবই আশা করা যায় তোমাদের প্রতি অনুগ্রহ করা হবে। (সূরা হুজুরাত : আয়াত ৯-১০)

মিথ্যা শপথ

১. আল্লাহর নাম এমন সব প্রতিজ্ঞার কাজে ব্যবহার করো না, যার উদ্দেশ্য হবে নেক কাজ, আল্লাহর ভয়, আল্লাহর বান্দাদের প্রতি কল্যাণকর করা হতে বিরত থাকা। বস্তুত আল্লাহ তোমাদের সমস্ত কথাই শুনছেন এবং তিনি সব কিছুই জানেন।
২. যে সব অর্থহীন প্রতিজ্ঞা তোমরা বিনা ইচ্ছায় করে ফেলো সেজন্য আল্লাহ তোমাদেরকে শাস্তি দেবেন না। কিন্তু যেসব প্রতিজ্ঞা তোমরা আন্তরিকতার সাথে করে থাকো সে সম্পর্কে আল্লাহ নিশ্চয় জিজ্ঞাসাবাদ করবেন। আল্লাহ বড়ই ক্ষমাশীল ও সহিষ্ণু। (সূরা বাকারা : আয়াত ২২৪-২২৫)

সরকার

(ক) কাকে মান্য করা হবে

১. হে ঈমানদারগণ, আর অনুগত্য করো আল্লাহর, আনুগত্য করো রসূলের এবং সেসব লোকেরও যারা তোমাদের মধ্যে সামগ্রিক দায়িত্বসম্পন্ন।
২. অতপর তোমাদের মধ্যে যদি কোন ব্যাপারে মতবৈষম্যের সৃষ্টি হয় তবে তাকে আল্লাহ ও রসূলের দিকে ফিরিয়ে দাও, যদি তোমরা প্রকৃতই আল্লাহ ও পরকালের প্রতি ঈমান এনে থাকো। এটাই সঠিক নীতি এটাই পরিণতির দিক দিয়ে উত্তম। (সূরা নিসা : আয়াত ৫৯)

লেখক : বোর্ড সেক্রেটারী, ইসলামী ব্যাংক বাংলাদেশ লিঃ, জয়েন্ট সেক্রেটারী, ইসলামিক ল' রিসার্চ সেন্টার এন্ড লিগ্যাল এইড্ বাংলাদেশ।

(খ) কে শাসন করবে

১. তোমাদের মধ্যে এমন কিছু লোক থাকতেই হবে যারা নেকী ও মংগলের দিকে ডাকবে। ভাল ও সত্য কাজের নির্দেশ দিবে এবং পাপ ও অন্যায় কাজ হতে বিরত রাখবে। যারা এই কাজ করবে তারাই সফল হবে।

২. তোমরা যেন সেসব লোকের মত না হও যারা বিভিন্ন ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র দলে বিভক্ত হয়ে গেছে এবং স্পষ্ট ও প্রকাশ্য নির্দেশ পাওয়ার পরও মতবিরোধে লিপ্ত হয়ে রয়েছে। যারা এরূপ আচরণ করে, তারা সেদিন কঠোর শাস্তি ভোগ করতে বাধ্য হবে। (সূরা আলে ইমরান : আয়াত ১০৪-১০৫)

(গ) কিভাবে শাসন করবে

হে নবী, এটা আল্লাহর বড় অনুগ্রহের বিষয় যে, আপনি এসব লোকের জন্য খুবই নম্র স্বভাবের লোক হয়েছেন। অন্যথায় আপনি যদি উগ্র স্বভাব ও পাষাণ হৃদয়ের অধিকারী হতেন, তবে এসব লোক আপনার চতুর্দিক হতে দূরে সরে যেত। অতএব এদের অপরাধ মাফ করে দিন। এদের জন্য মাগফেরাতের দোয়া করুন এবং দীন ইসলামের কাজকর্মে এদের সাথে পরামর্শ করুন। অবশ্য কোন বিষয়ে আপনার মত যদি সুদৃঢ় হয়ে যায়, তবে আল্লাহর উপর ভরসা করুন। বস্তুত আল্লাহ তাদের ভালবাসেন, যারা তার উপর ভরসা করে কাজ করে। (সূরা আল ইমরান : আয়াত ১৫৯)

লেখা আহ্বান

এই পত্রিকায় ইসলামী আইন ও বিচার সংক্রান্ত বিভিন্ন ধরনের তথ্যভিত্তিক ও গবেষণাধর্মী লেখা এবং সাময়িক প্রসঙ্গ স্থান পাবে। যেমন-

১. ইসলামী আইনের ইতিহাস

২. বিভিন্ন যুগে, বিভিন্ন দেশে ও বিভিন্ন শাসনামলে ইসলামী বিচার ব্যবস্থার স্বরূপ

৩. ইসলামী আইন ও প্রচলিত আইনের তুলনামূলক পর্যালোচনা

৪. ইসলামে অর্থনৈতিক, শ্রমনৈতিক, সামাজিক ও নারী অধিকার সংক্রান্ত বিধান

৫. বর্তমান যুগে মুসলিম দেশসমূহে শরীয়াহ আইন প্রবর্তনের প্রচেষ্টা ও প্রয়োজনীয়তা

৬. ইসলামী আইন ও মানবাধিকার

৭. যুগে যুগে মানব সভ্যতার ক্রমবিকাশ ও ইসলামী আইন

৮. গণতন্ত্র ও ইসলাম

৯. ইসলাম ও রাষ্ট্রীয় সামাজিক সন্ত্রাস ইত্যাদি

লেখার সাথে লেখকের পরিচিতি লিখে পাঠানোকেও গুরুত্বের সাথে গ্রহণ করা হবে। লেখা কাগজের এক পৃষ্ঠায় হতে হবে। অমনোনীত লেখা ফেরত দেয়া হয় না।

লেখা পাঠানোর ঠিকানাঃ
সম্পাদক
ইসলামী আইন ও বিচার
ইসলামিক ল' রিচার্স সেন্টার এন্ড লিগ্যাল এইড বাংলাদেশ
১৪ শ্যামলী রিং রোড, পিসি কালচার ভবন (৪র্থ তলা), শ্যামলী বাসস্ট্যান্ড, ঢাকা-১২০৭
ফোন : ৯১৩১৭০৫, ফ্যাক্স : ৮১৪৩৯৬৯ মোবাইল : ০১৭১২ ৮২৭২৭৬
E-mail : islamiclaw_bd@yahoo.com

আপনাদের প্রশ্নের জবাব

ইসলামী আইন ও বিচার এর পাতায় ইসলামী আইন ও বিচার ব্যবস্থা, ইসলামী শরীয়ত এবং দৈনন্দিন জীবন যাপনের বিভিন্ন ও বিচিত্র সমস্যাবলী সংক্রান্ত প্রশ্ন আহ্বান করা হচ্ছে।

দৃষ্টি আকর্ষণ

বছরে ৪টি সংখ্যা নিয়মিত প্রকাশিত হচ্ছে। গ্রহাক ও এজেন্টগণ যোগাযোগ করুন। নিয়মিত গ্রাহক ও এজেন্টদের জন্যে রয়েছে বিশেষ ছাড়।

পাঠকের মতামত

পাঠকের মতামত আমরা আগ্রহ সহকারে ছাপাই।

গ্রাহক চাদার হার

প্রতি সংখ্যা : টাকা ৩৫, প্রতি ৬ মাসে : টাকা ৭০, প্রতি বছরে : টাকা ১৩০

ইসলামিক ল' রিসার্চ সেন্টার এন্ড লিগ্যাল এইড বাংলাদেশ

এর প্রজেক্টসমূহ

- জার্নাল প্রজেক্ট
- সেমিনার প্রজেক্ট
- রিসার্চ এন্ড পাবলিকেশন প্রজেক্ট
- লিগ্যাল এইড প্রজেক্ট
- লাইব্রেরী প্রজেক্ট
- ক্যাম্পেইন প্রজেক্ট
- লেখক তৈরী প্রজেক্ট
- লেখক ফোরাম প্রজেক্ট
- উন্নয়ন প্রজেক্ট

১৪, পিসিকালচার ভবন, (৪র্থতলা) শ্যামলী বাস স্ট্যান্ড, ঢাকা-১২০৭
ফোন ঃ ৯১৩১৭০৫, মোবাইল : ০১৭১২৮১৭২৭৬, ০১৭১১৩৪৫০৪২
E-mail : islamiclaw_bd@yahoo.com

ইসলামী আইন ও বিচার
গ্রাহক/এজেন্ট ফরম

আমি 'ইসলামী আইন ও বিচার' এর গ্রাহক / এজেন্ট হতে চাই

☐ আমার জন্য ☐ প্রতিষ্ঠানের জন্য ☐ বছরের জন্য ☐ কপি প্রতি সংখ্যা

নাম ....

পদবী ....

পেশা ....

প্রতিষ্ঠানের নাম ....

ঠিকানা ....

.... ফোন/মোবাইলঃ ....

গ্রাহক পত্রের সঙ্গে .... টাকা নগদ/মানি অর্ডার করুন।

কথায় (..)।

স্বাক্ষর স্বাক্ষর

ম্যানেজার

৫ কপির কমে এজেন্ট করা হয় না, ৫ কপি থেকে ২০ কপি পর্যন্ত ২০% কমিশন
২০ কপির উর্ধে ৩০% কমিশন দেয়া হয়।

=> ১ বছরের জন্য গ্রাহক মূল্য-(চার সংখ্যা) = ৩৫X৪ = ১৪০/=

=> ২ বছরের জন্য গ্রাহক মূল্য-(আট সংখ্যা) =৩৫X৮ = ২৮০/=

=> ৩ বছরের জন্য গ্রাহক মূল্য- (বার সংখ্যা) =৩৫X১২ = ৪২০-২০=৪০০/=

গ্রাহক ফরমটি পূরণ করে নিচের ঠিকানায় পাঠিয়ে দিন

সম্পাদক

ইসলামী আইন ও বিচার

ইসলামিক ল' রিসার্চ সেন্টার এন্ড লিগ্যাল এইড বাংলাদেশ

পিসি কালচার ভবন, ১৪ শ্যামলী, শ্যামলী বাসস্ট্যান্ড, মোহাম্মদপুর, ঢাকা-১২০৭

ফোন : ৯১৩১৭০৫, ফ্যাক্স : ৮১৪৩৯৬৯ মোবাইল : ০১৭১২ ৮২৭২৭৬

E-mail : islamiclaw_bd@yahoo.com